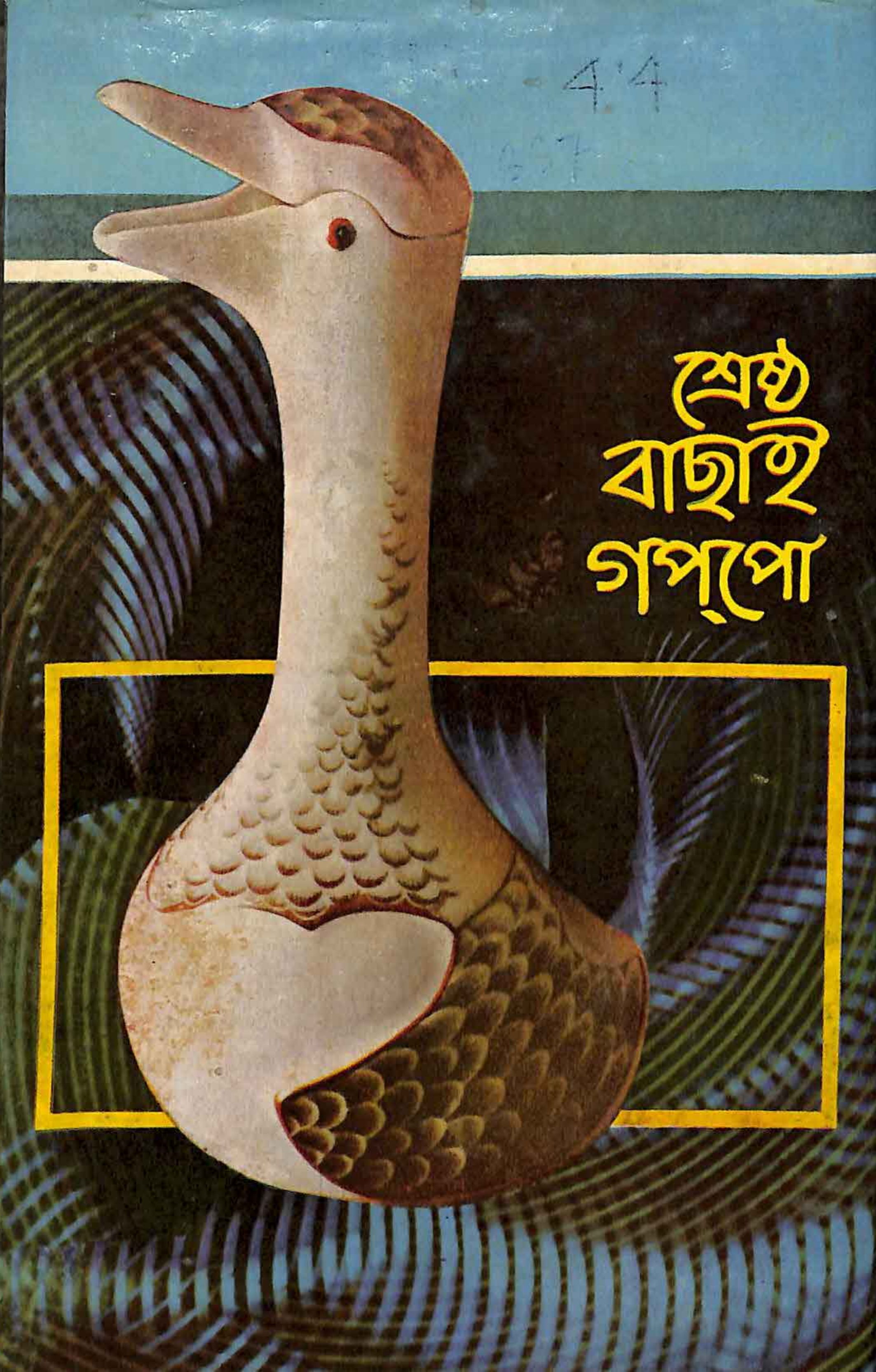

শ্রেষ্ঠ
বাছাই
গপ্‌পো

শ্রেষ্ঠ বাছাই গপ্পো

(শ্রেষ্ঠ লেখকদের বাছাই গল্পের সংকলন)

সম্পাদনা
অশোক মুখোপাধ্যায়

বিভা এণ্টারপ্রাইজ
কলিকাতা-৭০০০৬৫

প্রকাশিকা ঃ
শ্রীমতী বিভা ব্যানার্জ্জী
কলিকাতা-৬৫

প্রথম প্রকাশ
শুভ মহালয়া
১৩৯০

সম্পাদনা ঃ—
শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করন
পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

একমাত্র পরিবেশক
"জগাজ্যোতি"
ষ্টল নং—৭০
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর ঃ
ঘোষ প্রিণ্টার্স
শ্রীমৃণাল কান্তি ঘোষ
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৬

মূল্য—ছয় টাকা মাত্র

সম্পাদকের নিবেদন

বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিচিত্র প্রকারের কয়েকটি গল্পের একত্র গ্রন্থভুক্ত করার প্রচেষ্টা থেকেই এই সংকলনের সূত্রপাত। গল্পগুলি কিশোরদের জন্যে—ইংরেজীতে যাদের 'টীনএজার' বলে—তাদের উপযোগী; একেবারে শিশু-সাহিত্য নয়, যদিও ঐ নামেই এ ধরনের রচনা চলে আসছে।

নানান্ পত্রিকা ও পুস্তক থেকে গল্পগুলি প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রত্যেক লেখককে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বর্তমান সংকলক ও এককালে কিছু গল্প লিখেছেন, তাই তাঁরও একটি হাসির গল্প এখানে স্থান পেল।

অশোক মুখোপাধ্যায়

মহালয়া ১৩৯০
৫।২৬, ডি. গুপ্ত লেন
কলিকাতা-৫০

উৎসর্গ

কিশোর পাঠক পাঠিকাদের
মহালয়ার শুভেচ্ছাসহ ঃ
সম্পাদক

আমাদের প্রকাশিত

মিস্ট্রি "Z"

নাগমতী—

স্বামী পুত্র পরিবার

কিরিটি রায়ের সাথে ব্যোমকেশ

ও পরাশর বর্মা

ও

অন্যান্য

এতে যা আছে

এক

ছাগচরিত

অন্নদাশঙ্কর রায়

বাড়িতে দুটি মানুষ—আমার বন্ধু ও আমি। বড়ই ফাঁকা—ফাঁকা ঠেকে। ভাবি একটি কুকুর পুষ্‌লে কেমন হয়। কিন্তু ছোটবেলায় আমার পোষা কুকুর হঠাৎ পাগল হয়ে আমাকে কামড়ে দিয়েছিল, তারপর লণ্ডনের সেই যে পোষা কুকুর "ম্যাক্স" যাকে নিয়ে—অবসর সময়টিতে নানা আমোদ করা যেত—একদিন সকাল বেলা তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। হতভাগাটার একটা বদ স্বভাব ছিল—যে তাকে আদর করে ডাকত্‌-তারই সঙ্গে সে বোকার মতো ছুট্‌ত। খুব সম্ভব কোনও কুকুর-চোর তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। আমরা কত বিজ্ঞাপন দিলুম, কত দিন ও কত রাত তার পথ চেয়ে রইলাম, কতবার পরের কুকুরের গলার স্বর শুনে লাফ দিয়ে উঠ্‌লুম, ভাবলুম, "ঐ যে ম্যাক্স এসেছে।" অবশেষে একজন বল্লেন, লণ্ডনের একটি গুপ্ত স্থানে চোরা কুকুর সস্তায় বিক্রি হয়। তিনি ঠিকানা দিলেন। সেখানেও ম্যাক্স কে বিক্রী হতে দেখা গেল না। তখন আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লুম, "যাক্‌, মরে তো যায় নি মোটর চাপা পড়ে। মরলে সে খবর চাপা পড়ত না। ম্যাক্স যেখানেই থাকুক বেঁচে থাকুক"।

এই ঘটনার পর আর কার কুকুর পুষতে সাধ যায় বলো? অথচ কিছু একটা পুষতে ইচ্ছা করে। বেঁজি কিংবা বাঁদর পুষ্‌ব কিনা ভাবছি, সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে দেখি উঠানে কালো রঙের ছাগল বাঁধা রয়েছে।

আবু নামক আমদের যে কনোজিয়া ব্রাহ্মণ পাচকটি ছিল সে গদ গদ ভাবে বল্লে, "হুজুর, এহি বক্‌রাকো এক আদ্‌মী ভুলাকে লে যাতা থা।"

আবুর বিশুদ্ধ মুর্শিদাবাদী উর্দু শুনলে তোমরাও উর্দু ভাষার মৌলবী হতে পারতে কিন্তু সে সুযোগ তো পাওনি, তাই ওর উর্দু বক্তৃতার বাংলা সারাংশ দিই। ছাগলটাকে কে একটা লোক ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দেখে আবুর মনে সন্দেহ হয়। আবু বলে "এ বক্‌রী তুমার হোতে পারে না। তুমি ইকে সাথে লিয়ে যাচ্ছো কেনে?"

লোকটি ভয় পেয়ে ছাগলকে ছেড়ে দৌড় দিয়ে বাঁচল। আবু মিঞা সেটিকে যত্নে বেঁধে তার সুমুখে কিছু ঘাস রেখে দিয়ে রান্নঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন। সম্ভবত সেটিকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দান করতেন এবং দিন কয়েক পরে আমাদের টেবিলের উপর পরিবেশন করতেন। কিন্তু রান্না ফেলে রেখে বাড়ি গেলে তাঁর চাকরি থাকত না। সম্ভবত তিনি ধরে রেখেছিলেন যে আমরা তাঁর বাহাদুরির তারিফ করে ছাগলটি তাঁকেই দিয়ে দেব!

আমি ভাবছিলুম, ছাগল পুষ্‌লে তো মন্দ হয় না। খরচ কিছুই হয় না। ঘাস, কাগজ, ইট, কাঠ, হামান দিস্তা সবইতো ছাগলের খাদ্য। এক জায়গায় বেঁধে রেখে আমার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের অসংখ্য ছেঁড়া চিঠি তার সামনে ঢেলে দিলে দেশলাই খরচটাও বাঁচবে।

কিন্তু না জানি কোন গরীবের চোখের মনি এই ছাগল। আমরা তাকে বঞ্চিত করতে চাইনে। আমরা কাল সকালে এই ছাগল থানায় পাঠিয়ে দেবো তবে এই নধর প্রাণীটিকে এর মালিকের হাতে পৌঁছে দেবে কি নিজেদের উদরে পৌঁছে দেবে সে বিষয়ে সংশয় জাগছিল। খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দিলে হয় তো গরীবের দু'পয়সা লোকসান হবে, তবু ছাগলটিকে তো আস্ত পাবে।

আবুকে বল্লুম, "কাল ইস্‌কো পাউণ্ড্‌মে জরুর ভেজ দেনা। জিস্‌কী বকরী উও ছোড়ুয়া লেগা"।

এই দেখ, আমিও উর্দ্ধ বিদ্যায় আবুর দোসর।

আবু ক্ষুন্ন হলো। প্রতিবাদ করলো না। আমাদের আহরাদির পরে ছাগলটির প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করতে করতে খাবার উদ্যোগ কর্‌ল। এই সময় ছাগকণ্ঠের ভাষা প্রথম শুনলাম—"ব্যা"।

আবু বল্ল, "ও কিছুনয়। আপনি ওকে ঐখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র বাঁধতে যাচ্ছেন বলে ও আপত্তি জানাচ্ছে। ছাগলদের সহজেই একটা জায়গার উপর মায়া পড়ে যায়।"

আবু তার বাড়ি চলে গেল। বন্ধু গেলেন নিজের ঘরে ঘুমাতে আমি ঘুমুই উঠোনের দিকে দরজা খোলা রেখে, তারাময়ী নিশীথের প্রায় নিম্নে। একটু তন্দ্রার ঘোর লেগেছে। অন্ধকার রাত্রি, হঠাৎ ছাগলটার চীৎকার শুনে চোখ মেলে দেখলুম তার আশে-পাশে একটি শেয়াল। ছাগলের মত সর্ব জনপ্রিয় প্রাণী কোথা থেকে এক শেয়ালকেও আকর্ষণ করে এনেছে।

অগত্যা উঠতে হলো! হুঙ্কার দিয়ে শিয়ালকে তাড়া করে নিয়ে গেলুম। শেয়ালটা টের পাক্ যে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর প্রাণী ভূ-ভারতে আছে। এদিকে ছাগলটি সেই যে "ব্যা"—"ব্যা"—করা স্থরু করল, যতই তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে অভয় দিই কিছুতেই থামে না। তার কাছ থেকে দু'হাত দূরে গেলে তার স্বর সপ্তমে ওঠে! নিজের হাতে সেই অন্ধকার রাত্রে বাগান থেকে ঘাস তুলে আনি। খায় না, শুধু ডাকে "ব্যা—আ" "ব্যা—আ", "অর্‌র্‌", "বর্‌র্‌"! অল্প সময়ের মধ্যে আমি ছাগ ভাষাবিদ্ পণ্ডিত হয়ে উঠ্‌লুম।

তখন বোধ করি বারোটা বাজে। ছাগলটিকে ওখান থেকে খুলে নিয়ে এমন জায়গায় বাঁধলুম সেখান থেকে আমার বিছানা বেশী দূরে নয়। শেয়ালে ধর্‌লে ছাগলের চীৎকারে চট্ করে আমার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু তাতেও ফল হলো না। আমার বিছানার দিকে পা না বাড়াতেই ছাগলটী "ব্যা"—ব'লে কেঁদে উঠল।

শেষকালে সেটাকে নিয়ে খাটের পায়ায় বাঁধলুম। ভাবলুম এবার

সেও ঘুমবে, আমাকেও ঘুমতে দেবে। শিয়াল মশাইও সাহস করে এত দূরে এগোবেন না। মিনিট কয়েক পরে তার চীৎকার থাম্‌ল। ঘুম আমার চোখে সেই সুযোগে নামল। খাটের নীচ থেকে ফিস্‌করে কে বল্ল, "ব্যা"—

অমনি বল্লুম "চুপ।" সে আর একটু উঁচু গলায় বল্ল "ব্যা—আ।" আমি বিরক্ত হয়ে বল্লুম, 'ব্যা—আ" তখন দু'জনে মিলে পাল্লা দিয়ে কিছুক্ষণ "ব্যা—" করা চল্ল। ভেবে ছিলুম ছাগলটা হাল ছেড়ে দিয়ে



[অবাধ্য অভদ্র ছাগল]

চুপ কর্‌বে। কিন্তু সে তেমন জানোয়ারই নয়। সে চার পায়ের হাই হীল জুতো দিয়ে মেমসাহেবের মত খট্‌খ্‌ট করে খাটের নীচে মেজের উপর পায়চারি করা সুরু করে দিল। ছাগকণ্ঠের আর্তরব

একবার আমার মাথার দিকে আসে একবার আমার পায়ের দিকে যায়। হতভাগাটা খাটের তলায় ঢুঁ মারতেও ছাড়ে না।

অকৃতজ্ঞ অবাধ্য অভদ্র ছাগল। ঘুমের মায়া ত্যাগ করে সেটার দুই শিং ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চল্লুম একটি খালি ঘরে। ইচ্ছা করছিল তাকে কেটে কুটে খাবার বানিয়ে খাই। কিন্তু হাতের কাছে হাতিয়ার ছিল না, এবং খাবার বানাতে বিস্তর আয়োজন লাগে। তাছাড়া ঘুমটা যে পেয়েছিল সে আর কী বলব। রাত প্রায় একটা বাজে।

খালি ঘরে তাকে বন্দী ক'রে ফিরে এলুম। কিন্তু তার সেই ছাত ফাটানো আওয়াজখানাকে বন্দী করে কার সাধ্য। আমি বিছানায় শুয়ে দুই কান বন্ধ করে থাকলুম। কিন্তু অমন করে থাক্‌লে ঘুম আসবে কেন? গেলুম আবার সেই ছাগলের কাছে। পাঁচ মিনিট গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলুম। যদি গেটখুলে রাস্তায় ছেড়ে দিই তবে শেয়ালে তাকে ছাড়বেনা। অথচ এমন দজ্জাল ছাগলকে একমুহূর্ত বাড়িতে রাখতে নেই!

শেষে কি মনে করে তার গলা থেকে দড়ি খুলে নিয়ে তাকে বাগানে ছেড়ে দিলুম। এবার আর সে ডাক্‌ল না। সকালে উঠে তাকে বিদেয় করে দিয়ে অন্য কথা।

দুই পুরন্দরের বিল

নিখিলচন্দ্র সরকার

তারাপদ মনসাতলা হাটে এসে কেজি তিনেকের মতন আস্ত একটা রুইমাছ কিনে ফেলল। রুপোলি আঁশগুলো তখনো চকচক করছে। তারপর আরো টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনল। বাড়িতে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির দিকের কুটুম এসেছে। সূয্যি ডুবু ডুবু হওয়ার আগেই আজ বাড়ীর পথ ধরল। হাট থেকে যে রাস্তাটা পুবদিকে বাঁশঝাড়, ডুমুরের ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, সেই রাস্তা ধরে মাইল দেরেক পথ হেঁটে গেলে ডাইনে বাঁক নিতে হয়। এখান থেকেই আর একটা সরু রাস্তা বেরিয়েছে। এর এক পাশে ধানি জমি আর এক পাশে খাল। খানিকটা হাঁটলেই একটা পীরের দরগা। সেখানে অনেকগুলো বটগাছ। প্রচুর তার ঝুরি। আশপাশের গাঁয়ের বউঝি-রা এখানে মানত করে। দল বেঁধে এসে পুজো দেয়। এই পথ ধরেই আরো খানিকটা হাঁটলে তে-মাথার মোড়। এখানে এসে রাস্তাটা ত্রিশূলের মতন হয়ে নেমে গিয়ে মরাখালে মিশেছে। বাঁ দিকের পথ ধরে মিনিট কুড়ি হাঁটলেই চাঁপাতলা। ওই গাঁয়েই তারাপদর ঘর। ডানদিকের পথ ধরলেও যাওয়া যায়। খানিকটা এগিয়ে পুরন্দরের বিল ডাইনে রেখে, যেখানে কয়েকটা গাবগাছ জড়াজড়ি করে জায়গাটাকে আরো অন্ধকার করে রেখেছে, সেখান থেকেই সোজা উত্তর দিকে গিয়ে গয়লা পাড়ার ভেতর দিয়ে আবার চাঁপাতলা।

তবে সেটা অনেক ঘুড়পথ। এপথে সচরাচর কেউ যাতায়াত করে না। করলেও দিনের আলোয় আলোয়। সন্ধের পর তো নয়ই। তার কারণও আছে। রাস্তাটাও ভাল নয়। এবড়োখেবড়ো। তাছাড়া এখানে-ওখানে আসশেওড়ার ঝাড়। তেঁতুল গাছ, গাবগাছ। খাঁ-খাঁ করা প্রান্তর। জলাভূমি। তার পরই বিরাট একটা বিল! লোকে বলে পুরন্দরের বিল। মনে পড়লেই গায়ে কাঁটা দেয়। সাহসী লোকেরও বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করে।

হাটবারের দিনে তারাপদ রাত করে বাড়ি ফেরে। প্রতিবারই তে-মাথার কাছে এসে তারাপদ থমকে দাঁড়ায়। মরা খালের দিকে মুখ করে মনে মনে কী যেন সব বিড়বিড় করে। অনেকেই নাকি এখানে অনেক কিছু দেখেছে। কখনো কখনো কেউ কেউ পথ ভুল করে পুরন্দরের বিলের দিকে চলে গেছে। খোঁজ নেই। শেষে একদিন সেই বিলের তলা থেকে লাশ ভেসে উঠেছে। কেউ বলে গুমখুন। কেউ বলে, এ নির্ঘাত অদৃশ্য কোন প্রেতাত্মার কাজ। খুন হলেতো গায়ে তার দাগ থাকবে! শুধু ঘাড়টাকে আলগোছে মট করে ভেঙে দিয়েছে। তবে এইসব ভুতুড়ে কথা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করেনা। যারা বিশ্বাস করেনা তারাও এপথে সন্ধের পর কেউ আসে না

মাঝে মাঝে তেমাথার কাছে এসে গুণধরদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। গুণধর এখানে ওখানে রাত বিরেতে ঘুড়ে বেড়ায়। কেমন পাগল পাগল চেহারা। মুখ ভর্তি দাড়ি। মাথায় জটা। গাঁজা খায়। তান্ত্রিক। লোকে বলে ভূতটুত নিয়ে ওর কারবার। ও ভূত ছাড়ানো, ঝাড় ফুঁক জানে।

পীরের দরগার কাছে এসে তারাপদ দেখল, সন্ধের অন্ধকার গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির দানার মতন চারিদিকে ছড়িয়ে—পড়েছে। দেখতে দেখতে ফিকে অন্ধকারটা ঘন, আরো ঘন হচ্ছে। লণ্ঠনের আলো হাতে দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে কেউ কেউ। তে মাথার

মোড়টা যত তাড়াতাড়ি পেরনো যায়। আকাশে খইএর মতন ফুট-ফুট-করে তারা ফুটছে। তারাপদ আজ ভুল করে চার ব্যাটারির টর্চটা আনেনি। বাতাসে বটের শুকনো পাতা উড়তে উড়তে এসে তার গায়ে পড়ল। মাঠের দিক থেকে হিস্ হিস্ একটা শব্দ ভেসে আসছে। মনে মনে সে কী একটা হিসেব করল যেন। আজই অমাবস্যা। বারটাও মঙ্গলবার। বাঁ হাত ডান হাত করে মাছটা ঝোলাতে ঝোলাতে তারাপদ তাড়াতাড়ি করে পথ হাঁটছিল। কী আশ্চর্য্য, পীরের দরগার পর থেকেই একটা বেড়াল তার পিছু নিয়েছে। মিউ মিউ করে ডাকছে। তারাপদ ফিরে তাকাল। কালো কুচকুচ করছে বিড়ালটার শরীর। চোখ জ্বলছে। মাছের আঁশটে গন্ধে বেড়ালটার চোখ আরো চকচক করছে। এটা আবার এখানে কোত্থেকে এল? সেই থেকে বেড়ালটা তার পায়ে-পায়ে ঘুর-ঘুর করছে। আচ্ছা জ্বালাতন! হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল তারাপদ। ওটা তার দিকে চেয়ে আছে, চোখে যেন আগুন দপদপ করছে। 'যা ভাগ'। তারাপদ শব্দ করে তাড়া দিল। কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। হঠাৎ তার মনে হল, এ আবার অন্য কিছু নয়তো! মনে হতেই তারাপদ খুব জোরে একটা চিৎকার করে উঠলো, 'তবে রে……।' বলেই বিড় বিড় করে কি যেন আওড়াতে লাগলো। কোথায় বেড়াল! তারাপদ বুঝতে পারলো, আজ সে কিছুর পাল্লায় পড়েছে। তাহলেও সে ভীতু নয়। আশপাশে লোক জনও নেই। অনেকদূরে একটা লণ্ঠনের আলো দুলতে দুলতে মিলিয়ে যাচ্ছে। এবার একটু জোরে-জোরে সে পা ফেলতে লাগলো। যেই খানিকটা এগিয়েছে, অমনি তার মনে হল, পেছনে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়েছে। শোঁ—শোঁ শব্দে বাতাস ছুটছে। মট—মট করে ডাল পালা ভাঙছে। ফিরে তাকাল। কোথায় ঝড়! তারাপদ যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। সে দাঁড়াল না। গ্রাহ্যও করলো না কিছু। মনের সাহস একবার কমলেই ওরা পেয়ে বসে। এখন যদি একবার গুনধরদার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত।

তে মাথার মোড়ে-এসে সবে সে দাঁড়িয়েছে। চোখ বুজে শ্মশানের দিখে মুখ করে সে বিড়-বিড় করল। তারপর যেই না বাঁ দিকের পথ ধরতে যাবে ঠিক তখুনি দেখল, পথের উপর একটা মিশমিশে কালো কুকুর পথ আগলে বসে আছে। জিভটা লকলক করছে। চোখ আগুনের মত ধক ধক করে জ্বলছে। তারাপদ দাঁড়িয়ে থাকলো। কুকুরটা পথ ছাড়লো না। কতক্ষণ সে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে? ওটাকে ডিঙিয়ে যাবারও কেন যেন তার আজ সাহস হল না। তাকালেই বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে। ভাবল, ডান দিকের পথই সে ধরবে। আস্তে আস্তে সে সরে এলো। এবার ডান দিকের পথ ধরল। অন্ধকারে ভালকরে পথ দেখা যাচ্ছে না। মাঝে-মাঝে হোঁচট খাচ্ছে। একটা হিস্‌হিস্‌ করে শব্দ। পথটা ঢালু হয়ে নেমে যাচ্ছে। চলছেতো চলছেই। পথ যে আর ফুরতেই চায় না। মাঠে কারা যেন ফিস্‌-ফিস্‌ করছে। হঠাৎ মনে হল, সে মাঠে নেমে পড়েছে। একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া। পাটাও কাদায় ডুবে গেল। এ সে কোথায় যাচ্ছে! তার হুঁশ নেই। যখনই সে ডানদিকের পথ ধরেছে তখনই মনে হচ্ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন হাঁটছে। অথচ কাউকেই সে দেখতে পেল না। পা-টা ততক্ষনে আরো অনেকটা ডুবে গেছে। এত জল কেন? এমন সময় দেখল একটা ছায়ার মতন। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না। হঠাৎ সেই ছায়ার মতন লোকটা বলল, 'এইযে কর্ত্তামশায় আপনি যাবেন কোথায়?'

তারাপদ যেন এতক্ষন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। এই কথায় তা কাটল। একটু দম নিয়ে সে বলল, 'কেন, আমিতো যাব চাঁপাতলায়!'

'চাঁপাতলাতো অনেক দূর। এ পুরন্দরের বিলে এসে পড়েছেন।'

'পুরন্দরের বিল?' কথাটা স্পষ্ট হলনা। কেমন জড়িয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। এতক্ষণে তারাপদ ভয় পেল। গা ছম-ছম করল। চোখ বড়-বড় হল। কেন পাটা

কাদায় ডুবে যাচ্ছে, এখন সে বুঝতে পারল। এখানেতো দিনের বেলায়ও একা-একা কেউ আসতে সাহস করেনা। তার ওপর অমাবস্যার মঙ্গলবার। বাতাসে বিলের বুক থেকে চাপা কান্নার একটা গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। কে যেন তার পা-দুটোকে আটকে দিয়েছে। এতো সেই ভয়ংকর যায়গা। এখানে সে এল কী করে? তার শরীর কেমন অবশ-অবশ লাগছে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। একটু একটু ঘামছে।

সেই লোকটা ফের বলল, 'পথ ভুল করেছেন কর্ত্তা, আমার সঙ্গে আসুন।' বলেই লোকটা হাঁটতে শুরু করল।

তারাপদও লোকটার কথায় সংবিৎ ফিরে পেল। গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরলো না তার। জিভ শুকিয়ে গেছে। সেও হাঁটতে শুরু করল। লোকটা আগে-আগে যাচ্ছে। তারাপদ জোরে হেঁটেও লোকটাকে ধরতে পাচ্ছে না। খানিক্ষণ পরে আবার সেই তে-মাথার মোড়। লোকটা ফের বলল, 'এবার চিনতে পারছেনতো কর্ত্তা? বাঁ দিকের পথ ধরলেই চাঁপাতলা।'

এতক্ষনে তার বুকে বল এল। একটু একটু করে সাহস ফিরে পেল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'আমিতো সোজা পথ ধরব।'

সোজাপথ সেতো মরাখাল!' তারাপদ তাকিয়ে দেখল লোকটা সেই মরাখালের পথধরেই হেঁটে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে সেদিন অনেক রাত হয়েছিল তারাপদর। বাড়িতে কিছু বলেনি। সেই রাত্তিরেই তার খুব জ্বর এসেছিল। ভাবতে গেলেই সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। পুরো পুরি সুস্থ হতে তার আরো দিন সাতেক লাগল। এর পরেও তারাপদ নিয়মিত হাটে যায়। তবে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।

এর কদিন পরেই আবার একদিন সেই তে-মাথার মোড়ে গুনধর দার সাথে তার দেখা। তাকে দেখে গুনধর এগিয়ে এল। ও

হাসছিল মুখটিপে—টিপে। শেষে বলল, 'সেদিন কি হয়েছিলরে তোর ?'

তারাপদ চমকে উঠল। ওর মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষন। তাইতো! ও জানল কি করে! এতো কারো জানার কথা নয়! তবেকি সত্যই ও ভূত টুত নিয়ে কারবার করে! সে আমতা আমতা করল, 'কীজানি, কী যে হল সেদিন!'

গুনধর চোখ বড়-বড় করল, 'খুব জোর বেঁচে গেছিসরে সে দিন! প্রায় জায়গা মতন নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল। ওখানে একবার নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলেই ব্যাস্। সহজে ওখান থেকে কেউ ফিরে আসতে পারে না। তার ওপর অমাবস্যা, শনি-মঙ্গল বার হলেতো কথানেই।'

'ঠিক তাই, একটা লোক এসে তখন পথ না দেখিয়ে দিলে তো আসতেই পারতাম না।'

'ওইতো তোকে বাঁচিয়ে দিলরে।'

'তুমি চেন লোকটাকে ?'

'লোক কীরে—!' হো-হো করে হেসে উঠল গুনধর।

'বলো কী ?'

'তুই একটা হাঁদা। ওই সময় ওখানে লোক আসবে কোত্থেকেরে বোকারাম!' আবার একচোট হাসি। হাসি থামলে ওর চোখে চোখ রেখে বলল, 'তুই আসলে একটা খারাপ ভূতের পাল্লায় পড়ে ছিলি। আর একটু হলেই ও তোকে শেষ করে দিত। তোর বরাত জোরে ওই সময় একটা ভাল আত্মা এসে পড়ল ওখানে। তাই বেঁচে গেলি।'

'এরকমও হয় নাকি ?'

'কেন হবে না! মানুষ গুলোইতো বেঘোরে মরে ভূত হয়। মানুষের মধ্যেও তো ভাল মন্দ আছে। খারাপ লোকেরা খারাপই করে। আবার দেখবি, সংসারে যারা ভাল, পরোপকারী, দয়ালু,

তারা লোকের ভালই চায়। কারো সর্বনাশ করে না। বরং বিপদে আপদে এগিয়ে যায়। মরলেও স্বভাব যাবে কোথায়।'

তারাপদ হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল। মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ মনে হোল, তার যেদিন ওই রকম অবস্থা সে দিনই গাঁয়ের পরান মাইতি খুন হয়। সবাই জানত, ওরকম একজন সৎ, ভালমানুষ সাত গাঁ খুঁজলেও পাওয়া যায় না। তাহলে কি···? আর ভাবতে পারেনা তারাপদ।

গুনধর কী ভাবতে ভাবতে আবার বলতে শুরু করল, 'ভাগ্যিস, সেদিন ওখানে একটা ভাল আত্মা এসে পড়েছিল হঠাৎ! তা না হলে ঘোর অমাবস্যায়, শনি-মঙ্গলবারে ওখান থেকে কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারে? কেউ কখনো পেরেছে ফিরতে?' বলে আবার হা-হা করে হাসে গুনধর। কী খেয়ালে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যায়।

তারাপদ এখন আর ওর কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না। বরং নিজের কাছে সে একটা শান্তনা খুঁজে পেল। যাক, সংসারে একজন ভাল মানুষ হতে পারলে অন্তত ভাল একটা ভূতও হওয়া যায় তাই বা কম কী!

তিন দাঁত বাঁধানো কংকাল

শেখর বসু

বিখ্যাত দাঁতের ডাক্তার বিনায়ক সামন্ত তাঁর চেম্বারে বসে নতুন এক পাটি দাঁত খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। শীতের রাত। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে আজ আবার। শীতের সঙ্গে দাঁত ব্যাথার সম্পর্কটা বোধহয় একটু বেশি, কিন্তু রুগীপত্তর আজ তেমন আসেনি। দু-চারজন যারা এসেছিল, তারা চটপট ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে অনেকক্ষণ। আর কেউ হয়ত আসবে না। কিন্তু ডাক্তার চেম্বার বন্ধ করেননি, খুপরি ঘরে বসে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন একটার পর একটা। রাস্তায় চাপ চাপ কুয়াশা, কদাচিৎ হর্ন বাজাতে বাজাতে দু-একটা প্রাইভেট গাড়ি যাচ্ছে।

এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন ডাক্তার সামন্ত। এরকম মাঝে মধ্যে হয়। রোগ বলে কথা, উটকো সময়ে কিছু রুগী আসেই। তবে ভালমানুষ ডাক্তার কাউকে ফেরান না। ডাক্তার দাঁতের পাটি পরীক্ষা করতে করতে বললেন, 'বলুন'?

রুগী কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ডাক্তারের সামনে এসে দাঁড়াল।

ডাক্তারের চোখ-নামিয়ে কথা বলার অভ্যাস, তিনি সেইভাবেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী অসুবিধে?

রুগী এবারও কোনো উত্তর দিল না। ডাক্তার সামান্য অসন্তুষ্ট হয়ে চোখ তুললেন। চোখ তোলার পরেই ডাক্তারের চোখ উল্টে যাওয়ার কথা। ডাক্তারের জায়গায় অন্য কেউ থাকলে তার ঠিক তাই

হত। ডাক্তার কিন্তু একটুও ভয় না পেয়ে সামনের কংকালটার চোখের গর্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

কংকাল হাতজোড় করে বলল, ডাক্তারবাবু, খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

ডাক্তার একটু হেসে ফেলে বললেন, সবাই তাই আসে।

কংকাল একটু আমতা-আমতা করে বলল, 'আমি খুব ভয়ে-ভয়ে ছিলাম ডাক্তারবাবু। ভেবেছিলাম, আপনি বোধহয় আমাকে দেখে ভয় পেয়ে যাবেন, কিন্তু……।'

ডাক্তার এবার একটু চটে উঠে বললেন, 'ভূতের ভয় পেয়ে পেয়ে ভূতের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে এখন। হিসেব করে দেখেছি, ভূতের ভয় পেয়ে সার' জীবনে আমার মোট তিন বছর পাঁচ মাস নষ্ট হয়েছে। কম সময়! ভয় না পেলে ওই সময়টা আমি কত ভাবে কাজে লাগাতে পারতাম! আসলে আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, ভূতের ভয় পেয়ে সময় নষ্ট করা বড়লোকদের মানায়।

কংকাল একটু আহত হয়ে বললল, 'আমি কিন্তু ভূত নই, কংকাল। ভূতরা তো ছোট জাত।'

কংকালের কথায় ডাক্তার একটু বিরক্ত হলেন। 'আমি জাতটাত মানি না, আমার কাছে ভূতও যা কংকালও তাই। তা তোমার অসুবিধেটা কী বলে ফেল চটপট, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

কংকাল যে কাহিনী শোনাল এবার, তা অত্যন্ত করুণ। নিজের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কংকালের চোখের গর্তে জল এসে যাচ্ছিল বারবার।

কংকাল নানা কথায় যা বলল, তা ছোট করলে এইরকম দাঁড়ায়: 'আমি পুরনো আমলের কংকাল! আমার বয়স প্রায় একশো। তা, একটা সময় দিব্যি ছিলাম আমরা। ছোট কংকালরা বড়দের সম্মান করত, বড় কংকালরা ছোটদের স্নেহ করত। কোথাও কোনোরকম গোলমাল ছিল না। যে যার মান সম্মান নিয়ে দিব্যি গাছে

—গাছে ঘোরাফেরা করতে পারত। কিন্তু এখন দিনকাল একেবারে পালটে গেছে। এখনকার ছোট কংকালরা রাম-বিচ্ছু বড়দের মানা তো দূরের কথা, সুযোগ পেলেই তাদের পেছনে লাগে। ওদের জ্বালায় মরতে মরতে আমি এক নির্কংকাল এলাকায় চলে গিয়েছি। নিরিবিলি-তে বসে যে একটু সাধু কংকালদের নাম করব, তার উপায় নেই কিন্তু। বিচ্ছুর দল অদছুরে গিয়েও আমাকে জ্বালায়। সেদিন গাছের মগডালে বসে একটু ঝিমোচ্ছিলাম, এমন সময় একটা ছোট কংকাল গিয়ে পেছন থেকে আমাকে এমন এক ধাক্কা মারল যে……’

কথাটা শেষ করতে না পেরে কংকাল ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ডাক্তার সামন্ত এমনিতে খুব কড়া ধাঁচের মানুষ, কিন্তু কাউকে কাঁদতে দেখলে ওঁর গলার ভেতরটা ভার ভার হয়ে ওঠে। ডাক্তার ধরা গলায় বললেন, ‘আরে কি আশ্চর্য! কান্না কেন, পড়ে গিয়ে কি চোট লেগেছে?’

কংকাল চোখের গর্তের জল মুছে বলল, ’আজ্ঞে, শুধু চোট লাগলে আমি এত কষ্ট পেতাম না। আচমকা ওভাবে পড়ার জন্যে আমার ওপর পাটির তিনটে দাঁত ভেঙে গেছে।,

ডাক্তার সামন্ত আগেই লক্ষ্য করেছিলেন কংকালের তিনটে দাঁত ভাঙা, সেদিকে আর একবার তাকাতেই কংকাল একেবারে ভেঙে পড়ে বলল, ডাক্তারবাবু, কংকালের যদি দাঁতই না থাকে তাহলে তার আর কী-ই বা থাকল।’

বিরাট একটা নিশ্বাস ফেলে আবার কান্না জুড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু ডাক্তার ওকে থামিয়ে বললেন, ’থাক থাক আর কাঁদতে হবে না, তা আমার কাছে কী জন্যে? দাঁত বাঁধাতে?’

কঙ্কাল মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলল, ’আজ্ঞে হ্যাঁ।’

ডাক্তার আর একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, ’অনেক রাত হয়ে গেছে যে……আচ্ছা ঠিক আছে, সামনের চেয়ারে বসে পড়ো চটপট।’

কংকাল চেয়ারে বসল।

অনেক খেটেখুটে কংকালের দাঁত-তিনটে, নিখুঁত ভাবে বাঁধিয়ে দিলেন ডাক্তার। তারপর ওর সামনে ছোট্ট একটা আয়না তুলে ধরে বললেন, 'দেখ কেমন দেখাচ্ছে।'



[অনেক খেটে খুটে কংকালের দাঁত তিনটে বাঁধিয়ে দিলেন ডাক্তার]

আয়না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের দাঁত দেখে কংকালের মুখে হাসি আর ধরে না।

ডাক্তার হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'খুশি ?

কংকাল লম্বা করে ঘাড় কাত করল—

'হ্যাঁ-অ্যাঁ।' তারপরেই মুখ শুকনো করে বলল 'কিন্তু ডাক্তারবাবু···!'

'লাগছে ? ব্যাথা লাগছে ?'

কংকাল দুপাশে দ্রুত মাথা নাড়িয়ে বলল, ''ন্না, একটুও না। আমি বলছিলাম কি, মানে…' বলতে বলতে কংকাল হাতজোড় করল। 'আজকাল আমরা বড্ড গরিব হয়ে গেছি। তবে হ্যাঁ, একটা সময় আমাদের টাকা-পয়সা সোনা-দানার কোনো অভাব ছিল না। প্রায় প্রত্যেকটি কংকালই দু-চারটে গুপ্তধন পাহারা দিত। এখন আর সে যুগ নেই, মানুষরা এখন বাড়তি টাকা আর গয়নাগাটি ব্যাংকের লকারে রেখে দেয়। তার ফলে আমাদের হাতে আর কিছুই আসে না।

ডাক্তার গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলেন, 'এইসব কথা উঠছে কেন ?'

কংকাল কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আপনি আমার জন্যে এত করলেন ডাক্তারবাবু, কিন্তু আমি…সত্যি বলছি, আপনার ফিজ দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই আমার।

ডাক্তার এবার ধমকে উঠলেন—'তোমার কাছে কি আমি ফিজ চেয়েছি ?

'না, আপনি তো…

'তবে ?'

কংকাল এবার আর কোনো উত্তর দিতে পারল না।

ডাক্তারবাবু গরিবের বন্ধু, আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা কংকালের দিকে তাকিয়ে স্নেহের সুরে বললেন, 'আমি তো বাবা আগে কখনো ভূত-পেত্নির দাত বাঁধাইনি, একটা নতুন কায়দায় তোমার দাঁত সেট করেছি, সেটিং কেমন হয়েছে আমাকে জানিয়ে যেও মাঝেমধ্যে।'

কংকাল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, নিশ্চয়, নিশ্চয় এ আর বলতে!'

ডাক্তার কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'না, তোমার আর আসার দরকার নেই।'

মন-খারাপ করা গলায় কংকাল জিজ্ঞেস করল, কেন ?'

'কেন আবার, আমার রুগীপত্তর তো সব মানুষ। কে কখন তোমাকে দেখে ফেলে ভয়টয় পেয়ে কেলেংকারি বাধাবে শেষে।'

ডাক্তারের কথায় যুক্তি আছে। সত্যিইতো, সবাই তো আর ডাক্তারের মতো সাহসী নয়। তাহলে উপায় ?

শেষ পর্যন্ত উপায় বার করল কংকালই।

কংকাল বলল, 'দাঁত না থাকলে কংকালরা হাসতে পারে না। আমার হাসি শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমার দাঁত ভাল আছে। আমি মাঝে মধ্যে রাত্তিরে এসে ঘরের বাইরে থেকে হাসি শুনিয়ে যাব আপনাকে।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, 'বাহ! দারুণ বুদ্ধি বেরিয়েছে তো তোমার করোটি থেকে।'

সেই থেকে চার-ছ মাস অন্তর মাঝরাতে ডাক্তারের বাড়ির পাশে ভয়ংকর এক হাসির শব্দ শোনা যায়। হাসি শুনে ডাক্তার বুঝতে পারেন, কংকালের দাঁত ভাল আছে কিন্তু ইদানীং ছোট্ট একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে। তার জন্য অবশ্য কংকাল বেচারার কোনো দোষ নেই। কংকালটার বয়স হয়েছে অনেক, বয়েস হলে চোখে একটু কম দেখে সবাই, আর ভীমরতিও ধরে কারও-কারও। তা, এই কংকালটার দুটোই হয়েছে। তাই সে মাঝে মাঝে অন্য পাড়ায় গিয়ে অন্য বাড়ি ডাক্তারের ভেবে নিয়ে বিকট ওই হাসি হেসে ফেলে। রক্ত-হিম করা ওই হাসি শুনে চমকে ওঠে অনেকে।

কথাটা আমার কানে গেছে বলে তোমাদের জানিয়ে দিলাম। রাত্তির বেলায় হঠাৎ ওরকম হাসি শুনতে পেলে ভয় পেয়ো না কিন্তু।

চার জোড়া সাপ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেবার আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম কাশীতে, আমার ছোট মেসোর বদলির চাকরি, সেইজন্য আমার খুব মজা হয়েছিল। ছোট মেসো এক একটী নতুন যায়গায় বদলি হয়ে যান, আর আমি অমনি সেখানে বেড়াতে যাই। এই ভাবে আমার মুসৌরী, দেরাদুন, পুনা, তেজপুর, বিশাখাপত্তন—এইসব ভাল ভাল জায়গা দেখা হয়ে গিয়েছিল।

আমার ছোট মেসোকে আসলে বলা উচিত বিরাট মেসো। কারন তাঁর চেহারাটা ঠিক ভীমের মতন। তেমনি বাঁজখাই তাঁর গলার আওয়াজ, আর সাহসও সংঘাতিক। কেউ ভয়ে তাঁর সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড করেনা! তিনি এমন বজ্রমুঠিতে হাত চেপে ধরেন যে তারপর তিনদিন ব্যাথা থাকে। আমার ছোট মাসী আবার তেমনি ভীতু। টিকটিকি আরশোলা কিংবা মাকড়সা দেখলেই ছোট মাসী প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অবশ্য আমার সেই বিরাট মেসোও যে পৃথিবীতে একটি জিনিসকে খুব ভয় পান, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম সেবার কাশীতে।

ছোট মাসীরা বাড়ি নিয়েছিলেন বেনারস ষ্টেশনের উল্টো দিকে একটি নতুন পাড়ায়। পাড়াটা সবে তৈরী হচ্ছে। মাঠের মধ্যে মধ্যে উঠছে নতুন বাড়ি। মাঠগুলো ঝোপ ঝাড়ে ভরা খুব বড় বড় ইঁদুর আছে সেইসব মাঠে। এক একটি ইঁদুরের অন্তত দু কিলো তিন কিলো ওজন হবে।

কাশীতে বড্ড ফেরিওয়ালার উৎপাত। সারা দিনে কত ফেরিওয়ালা

যে আসে, তার ঠিক নেই। কাঁচের চুড়ি, ছাগলের দুধ, লুধিয়ানার কম্বল, পুরোনো ঘি, কাঠের পুতুল, আচার এসব নানারকম জিনিস বিক্রি করতে ফেরিওয়ালা আসে। এছাড়া বাঁদরের নাচ, ভাল্লুকের নাচ দেখাবার লোক আসে।

একদিন এলো একটি মেয়ে সাপুড়ে। এর আগে আমি কখনো মেয়ে সাপুড়ে, দেখিনি। বেশ গাঁট্টা গোট্টা চেহারার মাঝ বয়সী এক জন মেয়ে, সঙ্গে গেড়ুয়া রঙের কাপড়ে মোড়া তিনটে সাপ ভর্ত্তি ঝোলা, আর সেই মাঝখানটা বেলুনের মতন ফোলানো বাঁশী। সে অনেকখন ধরে বাজালো আমাদের বাড়ির সামনে। তার পর বললো, 'সাপ খেলা দেখবে গো! এ বাঙালী মাইজী!'

আমরা যে বাঙালি, সে কথা সে কী করে বুঝলো কে জানে! বোধ হয় চিংড়ি মাছ রান্নার গন্ধ পেয়ে ছিল।

ছোট মাসী বারান্দায় বেরিয়ে এসে মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, 'না দেখবো না! পরশুইতো একজন সাপুড়ে এসে খেলা দেখিয়ে গেল। আমরা কী রোজ রোজ বাঁদরের নাচ, ভাল্লুকের নাচ আর সাপের নাচ দেখবো নাকি!'

মেয়ে সাপুড়েটি অনেক কাকুতি মিনতি করলো, কিন্তু মন গললো না ছোট মাসীর!

তখন সাপুড়েনী বললো, 'বড় তিয়াস লেগেছে, এক বর্তন পানী দেবে মাইজী?'

কেউ জল চাইলে না বলা যায় না! ছোট মাসী জল আনতে গেলেন আর সাপুড়েনীটি তার ঝাঁপিগুলো নামিয়ে আমাদের বারান্দায় এসে বসলো।

ছোট মাসী এক জগ জল এনে দিলেন। সাপুড়েনী জগটা মুখের কাছে উঁচু করে ধরে ঢকঢক করে প্রায় অদ্ধেকটা জল খেয়ে নিল। তার পর ঝাঁপিগুলোর মুখ খুলে সাপগুলোর গায়ে ছিটিয়ে দিল খানিকটা। অমনি একটা হলদে কালো ডোরাকাটা সরু সাপ সরুৎ

করে বেরিয়ে এসে মেঝের উপর কিলবিল করতে লাগলো। ছোট মাসী ভয় পেয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে চ্যাচাতে লাগলেন, 'শিগগির ওটাকে তুলে নিতে বল। শিগগির ওকে বিদেয় কর।'

সত্যি কথা বলতে কি অত কাছে একটা সাপ দেখে আমারও একটু ভয় করছিল, একমাত্র ভয় পেলোনা, ছোট মাসীর দেড় বছরের ছেলে বাবলু। সে খল্‌খল্‌ করে হেসে বলতে লাগলো, 'সাপ ধরবো! সাপ ধরবো!"

বাজারের মাছওয়ালারা যেমনভাবে সিঙ্গিমাছ ধরে, সাপুড়েনী সেই রকম অবহেলার সঙ্গে সাপটার মাথা চেপে ধরে সেটাকে আবার ঝাঁপিতে পূরে দিল। তারপর উটেরা যেমন ভাবে গন্ধ শোঁকে সেই রকম ভাবে ঠোঁট আর নাক কুঁচকে রেখে বললো,—'মাইজী তুম্‌হার কোঠার পাশে মাঠে সাপ আছে পাঁচঠো রূপিয়া দো, সাপ ধরে দেবো!

ছোট মাসী খিল খিল করে হেসে উঠলেন। আমিও হাসলাম। এ বাড়ির চাকর শুকদেও ও হাসলো। কারণ, ঠিক দু'দিন আগেই আমাদের উল্টোদিকের বাড়িতে সাপ খেলা দেখাতে এসে একজন সাপুড়ে ঠিক এই কথা বলেছিল। আর মাত্র দু'টাকা চেয়ে সে বাড়ির সিঁড়ির তলা থেকে দুটো সাপ ধরে দিয়েছিল। ঐ সব সাপুড়েরা মনুমেণ্টের মাথা থেকেও যখন তখন সাপ ধরে দিতে পারে। উল্টো-দিকের বারান্দা থেকে আমরা স্পষ্ট দেখেছিলাম, সাপুড়েটার আল-খাল্লার নীচে কোমরে জড়ান ছিল দুটো সাপ—সেই দুটোই খুব কায়দা করে বার করলে, ম্যাজিসিয়ানরা যেভাবে টুপীর ভেতর থেকে খরগোশ বার করে।

আমাদের সকলের একসঙ্গে হাসি শুনে সাপুড়েনী একটু ঘাবড়ে গেল বোধ হয়। আর বেশী উচ্চবাচ্য করলনা। ঝাঁপীগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল। ছোট মাসী বারান্দা ফিনাইল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেললেন।

খানিকটা দূরে বেশ কিছুক্ষণ, পেট ফোলানো বাঁশীটার আওয়াজ শোনা গেল। বোধহয় সাপুড়েনী আর কোন বাড়িতে খেলা দেখাবার সুযোগ পেয়েছে।

পরের রবিবারে ছোট মেসো আমাদের সারনাথ ঘুরিয়ে নিয়ে এলে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। তারপর ছোট মাসীর শোবার ঘরে বসে আমরা চা খাচ্ছি, রেকর্ড প্লেয়ারে ওস্তাদ গুলাম আলী খাঁর গান বাজছে এমন সময় হঠাৎ আলো নিভে গেল আর গুলাম আলীর গলাটা বিশ্রী মোটা হয়ে থেমে গেল।

আমরা কলকাতার ছেলেরা যখন তখন আলো নিভে গেলে আর অবাক হইনা। ছোট মাসী বললেন, 'দুর ছাই'! ছোট মেসো বললেন 'এই সুরু হল জ্বালাতন!'

কারুরই অবশ্য মোমবাতি খোঁজবার উৎসাহ হল না! সেদিন পাতলা পাতলা জ্যোৎস্না ছিল। জানালা দিয়ে তার একটু আলো এসে পড়েছে। আমরা সেই আবছা অন্ধকারেই বসে বসে চা খেতে লাগলাম। অন্ধকারে আর যাই অসুবিধে হোক, খাবার খেতে কোন অসুবিধে হয় না। হাতের বিস্কুটটা ঠিক মুখেই চলে আসে, সেটা আমরা ভুল করে কানে গুঁজে দিই না।

তিনজনে মিলে নানা রকম গল্প করছিলাম। একসময় আমার চোখে পড়ল মেঝেতে কী যেন চকচক করছে। মনে হলো খানিকটা জল পড়ে আছে, তার ওপর এসে পড়েছে চাঁদের আলো। এখানে জল এলো কি করে? তারপর মনে হোল, জলটা যেন নড়ছে। তারপর আর কিছুই মনে হোল না, আমি লাফিয়ে উঠে বললাম 'সাপ'!

আমি ছোটমাসীকে ভয় দেখাবার জন্য অনেক সময় মিছিমিছি বলি, 'ছোটমাসী, তোমার পায়ের কাছে একটা আরশোলা! ছোট মাসী তোমার পায়ের কাছে একটা আরশোলা!' ছোট মাসী সেইরকম কিছু একটা ভেবে চেয়ারেই বসে রইলেন। ছোট মেসো স্প্রিংয়ের মতন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাপ? কোথায়?

'ঐ যে সামনেই।'

একথা বলেই আমি ছোট মাসির হাত ধরে ঝট্‌কা টান মেরে ছুটলাম। আমি আর ছোট মাসি চলে এলাম বসবার ঘরে। আর শোবার ঘরের পেছনে একটা ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকলেন ছোট মেসো। দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজা। ততক্ষণে আমরা সাপটার দু'বার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

দারুণ ভয় পেয়ে ছোট মাসি ধপাস করে সোফার ওপর বসে পড়তে যাচ্ছিলেন, বোধহয় অজ্ঞান হয়েই যেতেন, কিন্তু তক্ষুনি আবার উঠে চিৎকার করে বললেন, 'বাবলু! বাবলু রয়েছে যে ঘরের মধ্যে!'

সত্যিই তো। সারনাথ থেকে ফেরবার পথেই বাবলু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে কোলে করে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল খাটে বাবলু তো সেখানেই ঘুমিয়ে রয়েছে!

এরপর দেখলাম; ছোটমাসী আর ছোট মেসোর একদম উল্টো ব্যবহার! দারুণ সাহসী ছোট মেসো ঘরের দরজা আর খুললেনই না সেখান থেকে চেঁচিয়ে বললেন 'কী হোলো'? সাপটা গেছে? কত বড় সাপ?'

আর যে ছোট মাসী আরশুলা দেখলেই মূর্চ্ছা যান, তিনি তক্ষুনি ছুটে আবার সেই সাপের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। আমি ছোট মাসীর হাত চেপে ধরলাম। বিছানার ওপর ঘুমিয়ে থাকা বাবলুকে হয়তো সাপটা না কামড়াতেও পারে, কিন্তু ছোট মাসী ঘরের মধ্যে ঢুকলে নির্ঘাৎ কামড়াবে।

আমাদের চ্যাচামেচি শুনে শুকদেও ছুটে এলো আর সে চট করে একটা টর্চ জোগাড় করে ফেললে। টর্চের আলোটা যাতে সে সাপটার মুখের ওপর না ফেলে তাই আমি টর্চটা হাত থেকে নিয়ে নিলাম। যতদূর জানি সাপ কানে শুনতে পায়না—তাই আমাদের চিৎকার সে গ্রাহ্য করতে নাও পারে, কিন্তু চোখে আলো ফেললে নিশ্চয়ই রেগে যাবে। আলোটা একটু তেরছা ভাবে ফেলে দেখলাম সাপটা একটা

বিরাট ফনা তুলে লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে আর এদিকে ওদিক মুখ ঘোরাচ্ছে। সাপটা অন্তত চার হাত লম্বা, মাঝে মাঝে জিভ বার করছে চিরিক চিরিক করে। দেখলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

ছোটমাসী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সুনীল, শিগগির সাপটাকে মার।'

কিন্তু বললেই কি আর অতবড় সাপটাকে মারা যায়? কাছে এগোলেই যদি লাফিয়ে এসে কামড়ায়?

সত্যিকথা বলতে কি, ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল। আমি বাঘ, ভাল্লুক, ভূতের চেয়ে সাপকে বেশী ভয় পাই। তবু ঘরের মধ্যে বাবলু রয়েছে, একটা কিছু করতেই হবে।

আমি বললাম, 'শুকদেও, লাঠি কোথায়? লাঠি? শুকদেও দৌড়ে গিয়ে একটা ডাণ্ডা নিয়ে এলো। সাপটা কি করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে জানিনা। কিন্তু এখন সে বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে মনে হয়। সাপেরা সিমেণ্টের মেঝে পছন্দ করেনা। ফণা তোলা অবস্থায় একটু খানি চলতে গিয়েই চটাং চটাং করে পড়ে যাচ্ছে। তাতে রেগে উঠে আরও ফণা তুলছে।

সাপটাকে তক্ষুনি মারবার বদলে, ওটা যদি কোনো রকমে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতো, তাহলে আমরা বাঁচতুম। কিন্তু সাপটা উল্টো কাজ করলো। সেটা আমাদের দিকেই খানিকটা এসে একটা দরজার পাশে লুকিয়ে পড়লো। চৌকাঠের সঙ্গে লেগে থাকা তার খানিকটা লেজ আমরা তখনো দেখতে পাচ্ছি।

সর্বনাশ! এবার তো আমরা ঘরেও ঢুকতে পারবোনা! বাবলু যদি ঘুম ভেঙ্গে হঠাৎ খাট থেকে নেমে আসে!

ওপাশের বন্ধ ঘর থেকে ছোট মেসো আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হোলো, সাপটা গেছে?'

ছোট মাসী বললেন, 'না! তুমি বেরিয়োনা একদম।' ছোট মাসী তারপর আরও সব অসম সাহসিক কাজ করতে লাগলেন।

রান্নাঘর থেকে কেরোসিনের টিনটা এনে প্রায় দরজার চৌকাঠ

পর্যন্ত এগিয়ে অনেকখানি কেরোসিন ছিটিয়ে দিলেন ঘরের মধ্যে। তারপর একগাদা খবরের কাগজ পাকিয়ে তাতে কেরোসিন ঢেলে রান্নাঘরের উনুন ছুঁইয়ে আগুন জ্বেলে আনলেন। তারপর সেই খবরের কাগজের মশালটা ছুঁড়ে দিলেন সাপটার গায়ে। গায়ে আগুন লাগতেই সাপটা দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে আবার ফণা তুললো আর সেই আগুনে ঘরের মধ্যের কেরোসিনও জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে।

ছোটমাসীর উপস্থিত বুদ্ধি সাংঘাতিক বলতে হবে। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলছে বলে সাপটা আর ঘরের মধ্যে গেলনা, চৌকাঠের সামনে কিলবিল করতে লাগলো।

এই সময় এই হট্টগোলে বাবলু জেগে উঠলো। ডেকে উঠলো' 'মা—'

ছোটমাসী প্রায় পাগলের মতন হয়ে গিয়ে কেঁদে চিৎকার করে বললেন,—'বাবলু, বাবলু খাট থেকে নামিস না—'

সেই সময় শুকদেও সাপটার গায়ে একটা ডাণ্ডা কষালো। কিন্তু লাঠি দিয়ে সাপ মারা খুব সোজা কথা নয়। মারটা খেয়ে সাপটার বিশেষ কিছুই হলোনা, সে চৌকাঠ ছাড়িয়ে এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। সাপ দারুণ জোরে ছুটতে পারে এক এক সময়, কিম্বা লাফাতেও পারে।

সেই মুহূর্তে সাপটা আমাদের একজনকে ছোবল মারতে পারতো। কিন্তু শুকদেও তক্ষুনি তার ডাণ্ডাদিয়ে সাপটাকে মেঝের সঙ্গে চেপে ধরলো।

তখন দেখলাম শুকদেও'র কী দারুণ সাহস আর গায়ের জোর। সিমেন্টের মেঝেতে একটা সাপকে চেপে ধরে থাকা কি সোজা কথা? সাপের গাটাই তো তেল তেলে!

আমি একলাফে তিন পা পিছিয়ে গিয়েছিলাম। আবার এগিয়ে গেলাম। সাপটা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ভীষণ ভাবে ছটফট

করছে। শুকদেও চেপে ধরে আছে ঘাড়ের কাছটা। আর সাপটার লেজটা একটা চাবুকের মতন ছটাস ছটাস করে পড়ছে মেঝেতে। এক একবার চেষ্টা করছে লাঠিটাকে পাকিয়ে ধরার জন্য।

শুকদেও চেঁচিয়ে উঠলো 'দাদাবাবু আভি উসকো মারিয়ে!'

দেখলাম শুকদেওর মুখে ঘাম জমে গেছে, দাঁতে দাঁত চেপে আছে। সাপটার নিশ্চয়ই খুব গায়ের জোর। শুকদেও বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না। ছোটমাসী সবটা কেরোসিন ছড়িয়ে দিলেন মেঝেতে, আবার কাগজ জ্বেলে ছুঁড়ে দিলেন সেখানে। এখন সাপটার সব দিকেই আগুন তবু কিন্তু নড়ছে সহজে, ছটফট করে যাচ্ছে সমানে!

আমি কি দিয়ে সাপটাকে মারবো? হাতের কাছে কোনো জিনিস নেই। একটা চেয়ার ছুঁড়ে মারলে কি কোন লাভ হবে? কিছুই ঠিক করতে পারছি না। যদি শুকদেও'র হাত পিছলে যায়, যদি সাপটা আগুন পেরিয়ে আসে···

ছোট মাসী বললেন 'সুনীল রান্না ঘর থেকে শীল নোড়া··· নোড়াটা নিয়ে আয়—'

কিন্তু তার আগেই সাপটা শুকদেও'র লাঠির তলা থেকে পিছলে বেরিয়ে এলো। তারপর আগুনের শিখা ছাড়িয়ে ফণাটা তুলে আমাদের দিকে তাকালো। শুকদেও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের গতিতে ডাণ্ডাটা দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে মারলো সেই ফণাটার ওপর। তাতেই ফণাটা ছাতু হয়ে গেল, সাপটা নেতিয়ে পড়লো আগুনের ওপর। শুকদেও তখনও দমাদম করে পেটাতে লাগলো এক জায়গায়। সাপটা আর নড়লোনা।

ছোট মাসী আগুন ডিঙিয়ে গিয়ে বাবলুকে কোলে তুলে নিলেন।

আমি আর শুকদেও ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম মাটিতে। সারা ঘরে সাপ পোড়ার বিশ্রী গন্ধ। বমি এসে যাচ্ছে প্রায়। শুকদেও আবার আগুন থেকে লাঠি দিয়ে বার করে আনলো সাপটাকে।

জায়গায় জায়গায় আগুনে ঝলসে সাপটা যেন হঠাৎ মোটা হয়ে গেছে।

এতক্ষণ পরে বেরুলেন ছোট মেসো। তিনি সাপটাকে দেখে বললেন, 'বাবা, এতবড়' সাপ? সাপকে বিশ্বাস নেই, ওরা অনেক সময় মটকা মেরে থাকে!'

তিনি শুকদেও'র হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে সেই মরা সাপকে মারলেন কয়েক ঘা।

ছোট মাসী বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে! এবার ওটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসো।'

ছোট মেসো বললেন, 'রাস্তায় ফেলবে কি? বৃষ্টির জল লাগলে সাপ আবার বেঁচে যায়।'

সে আর কি করা যাবে! শুকদেও আর আমি অনেকটা দূরে সাপটাকে ফেলে দিলাম মাঠের মধ্যে। নিশ্চিন্ত হবার জন্য দুটো থান ইট দিয়ে আরও কয়েকবার ঠুকে দিলাম ওর মাথা। নাঃ সাপটা মরে গেছে নিশ্চয়। সাপেরা তো আর অমর হতে পারেনা।

সেদিন আর সারারাত ঘুমই হলো না বলতে গেলে। ছোট মাসীর ধারনা হলো সাপটার বিষ নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে পড়েছে। দুটো ঘর একবার ফিনাইল আর একবার ডেটল ছড়িয়ে খুবকরে ধোওয়া মোছা হলো। তারপর বহুক্ষণ জেগে আমরা অনবরত ঐ ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। সত্যি খুব জোর একটা ফাঁড়া গেছে। ছোট মাসী বার বার ছোট মেসোকে ঠাট্টা করে বলতে লাগলেন। তুমি কি দরের বীরপুরুষ বোঝা গেছে। আমরা তিনজন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সাপটা মারলাম আর তুমি দরজা বন্ধ করে বসে রইলে?'

ছোট মেসো বললেন 'আহা, তোমরাই তো আমাকে বেরুতে বারণ করলে।'

ছোট মাসী বললেন। 'থাক্ থাক্! সব বোঝা গেছে।

তোমার তখন গলা কাঁপছিল। এ বাড়িতে আর থাকবো না। তুমি অন্য বাড়ী খোঁজ কর।’

সাপটা মারার ব্যাপারে যদিও আমি বিশেষ কিছুই করিনি। তবু ছোট মাসী যে আমাকে কৃতিত্বের খানিকটা ভাগ দিলেন, তাতে আমি খুশিই হলাম। পরদিন সকালে উঠে দেখে এলাম মরা সাপটা একই জায়গায় পড়ে আছে। বেঁচে উঠে পালায়নি।

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হলোনা। আমাদের সাপ মারার কাহিনীটা পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। অনেকে এ পাড়ায় সাপের কথা শুনে দারুণ অবাক হলো। অনেকে আমাদের সাহসের প্রশংসা করলো। অনেকে আমাদের ভয়ও দেখালো খুব। প্রত্যেক সাপেরই একটা করে জুটি থাকে। একটাকে মারলে অন্যটা এসে প্রতিশোধ নেয়।

এরকম একটা কথা শুনেআসছি বটে, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হয় না।

পাঁচ পতন

অশোক মুখোপাধ্যায়

ভদ্রলোক বড় ব্যস্ত।

সমাজের উঁচু তলার লোক। যাকে বলে ভি-আই-পি। পয়সা আছে, প্রতিষ্ঠা আছে; সুতরাং প্রতিপত্তিও আছে। বেশ সমীহ করে চলতে হয় তাঁকে।

কিন্তু আমি একজন সাধারণ; নিতান্তই ভি-ও-পি। তাঁর মত উঁচুদরের লোকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকার কথা নয়। অথচ তাঁকেই আমার দরকার। তাঁকে না ধরলে আমিই বা উঠব কি করে ওপর দিকে? নগণ্যের দিকে যদি কৃপাদৃষ্টি তিনি না দেন, তাহলে আমিই বা গণ্যমান্য হব কি করে?

কিন্তু কখন পাই তাঁকে? সারাটা দিন—সকাল থেকে সন্ধ্যে—তাঁর মূল্যবান সময় খুব হিসেবের সঙ্গে খরচ হয়ে থাকে। সেই মাপা সময়ের মধ্যে থেকে অন্তত মিনিট পনেরো আমি কি করে ছিনিয়ে নিই?

সকালে বাড়ীতে তাঁকে পেলাম না। বিকেলে একটা সাময়িক পত্রিকায় আংশিক সময়ের জন্যে তিনি সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত। ভাগ্যক্রমে সেই পত্রিকার অফিসে তাঁকে পেয়ে গেলাম।

—কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসু চোখে তিনি তাকালেন।

আমার বক্তব্যটা নিবেদন করতে গিয়েই বাধা পেলাম।

—এখন তো বড় ব্যস্ত। আচ্ছা, কাল সন্ধ্যে সাতটার সময়ে

আমার কলেজে আসুন। সাতটা থেকে পৌনে আটটা পর্যন্ত ঐ পিরিয়ডটা আমার অফ্ আছে।

ভদ্রলোক আমাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে একটা ফাইলে মনোযোগ দিলেন।

আমি যেন কৃতার্থ হয়ে গেলাম। পনেরো মিনিট নয়, একেবারে পঁয়তাল্লিশ মিনিট তিনি আমার জন্যে ব্যয় করবেন।

কলেজে গিয়ে প্রফেসরদের ষ্টাফ্ রুমে তাঁকে পেলাম না। নাম জিজ্ঞাসা করতেই সবাই যেন আকাশ থেকে পড়ল। ও নামে কোন অধ্যাপক নেই এ কলেজে। কিছুক্ষণ বাদে আমি আকাশ থেকে নয়, সোজা চাঁদ থেকেই পড়লাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই কমনরুম। সৌভাগ্য, কমনরুমের সামনেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সঙ্গে হাতে বই-খাতা নিয়ে কিছু ছাত্র।

কথাবার্তা সেরে বেরিয়ে এলাম।

কৌতূহল হল। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর কথা।

—অধ্যাপক কোথায় মশাই। উনি তো সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র!

মনে মনে হাসলাম। আমারই ভুল হয়েছে তাহলে! উনি কলেজে আসেন, পড়াতে নয়। পড়তে।

———

ছয় ভালমানুষ হরবাবু

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বাড়িতে চোর ঢুকেছে টের পেয়ে হরবাবু বিছানায় উঠে বসে আপন মনে বললেন—'এসব কী অসভ্যতা ?

ভারী বিরক্ত হয়ে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে চুপ করে বসে জ্যোৎস্না দেখতে লাগলেন। চুরিটুরি খুব অপছন্দ করেন হরবাবু। তাঁর চোখের সামনেই চুরি হোক—এটা তার সহ্য হবে না।

চোরটা বড়ই নির্লজ্জ। পাপ কাজ গোপন করার কোন চেষ্টাই নেই। বারান্দায় বসেই তিনি শুনতে পেলেন, ঘড়ে বাক্স প্যাঁটরা নাড়ার, বাসন কোসন পড়ার, আলমারি ভাঙ্গার বিকট সব শব্দ হচ্ছে।

রেগে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে হরবাবু ধমক মারলেন—'আস্তে! বেহায়া কোথাকার!'

চোরটা বা চোরেরা তাতে খানিকটা যেন সাড়াশব্দ কম করতে লাগল। কিন্তু ব্যাটাদের কাজ আর শেষ হয় না! ভারী আনাড়ী চোর সব হয়েছে আজকাল, কিছু শিখবেনা, জানবেনা, দুদিন একটু ট্রেনিং নিয়েই কাজে নেমে পড়ে।

হরবাবু জ্যোৎস্না দেখতেই লাগলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে ঘর থেকে একটা কর্কশ গলা যতদূর সম্ভব মোলায়েম হয়ে বলল—'কাম হয়ে গেছে বড়বাবু। এখন আরাম করে শুয়ে পড়ুন।'

হাই তুলে হরবাবু উঠলেন এবং সরে গিয়ে বিছানায় শুলেন।

ভারী লোভী আর অভদ্র চোর সব আজকালকার। বিছানার চাদর বালিশের পাশে টর্চ—সব নিয়ে গেছে। কাঁচের গ্লাসে জল ঢেকে ছিলেন রাতে খাবেন বলে সেটা শুদ্ধু নেই।

চোরে সব নিয়ে গেছে। তবুতো বাজার করতে হবে, রাঁধতে হবে, খেতেও হবে। হরবাবু তাই ধার কর্জ্জ করে বাজারে চললেন সকাল বেলায়।

আলুওলা, পটলওলা, মাছওলা সবাই ভালো মানুষ হরবাবুকে ভালভাবে চেনে। হরবাবুর যেদিন আলুর দরকার নেই সেদিনও আলুওলা তাকে পাকড়াও করে ব্যাগের মধ্যে জোর করে দুকেজি আলু ঢুকিয়ে দেয়। হরবাবু ঝিঙে বা করলা খান না, কিন্তু তা বলে ঝিঙে বা করলাওলারা তাঁকে ছাড়ে না। প্রায় দিনই তাকে সের খানেক ঝিঙে আর করলা কিনে আনতে হয়। সেগুলো ঘরে পড়ে থেকে পচে যায়। হরবাবু আপন মনে রাগারাগি করেন। তরকারিওলারা হয়েছে যতসব গুণ্ডা বদমাস।'

ধার করা পয়সায় বাজার করতে বেড়িয়েছেন, রাস্তায় খলিফা হালদারের সঙ্গে দেখা।

—'এইযে হর, তুমি মাস তিনেক আগে একশটাকা ধার নিয়ে ছিলে, তার কী করলে?'

হরবাবু খুব ব্যাথিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন। কথাটা ঠিকই যে মাস তিনেক আগে হরবাবু—খলিফা হালদারের কাছে একশটাকা ধার নিয়ে ছিলেন। কিন্তু হরবাবুর খুবই পষ্ট মনে আছে যে, একমাস বাদে টাকাটা শোধ করে ছিলেন। কিন্তু সেই খালিফাবাবুর মনে ছিলনা বলে পরের মাসেই আবার নতুন করে টাকাটা তাকে শোধ করতে হয়। সেটাও হরবাবু হাসি মুখেই মেনে নেন। ভূলতো মানুষের হয়ই। কিন্তু ফের গত মাসেও খালিফা সেই একশ টাকার তাগাদা দেওয়াতে একটু বিরক্ত হয়েই হরবাবু আবার টাকাটা শোধ

করেন। সে যা যাওয়ার গেছে। কিন্তু খলিফা আজ আবার চাইছে।

হরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুব সংকোচের সঙ্গে বললেন—'টাকাটা কি আপনাকে দিইনি?'

—'দিয়েছো? কবে দিলে? কৈ আমার তো মনে পড়ছেনা।'

হরবাবু মাটির দিকে তাকিয়ে লজ্জার সঙ্গে বললেন 'তাহলে তো দিতেই হয়। তা নেবেন। দুচার দিনের মধ্যে দিয়ে দেব।'

মুদীর দোকান থেকে ধারে জিনিষ কেনেন হরবাবু। মুদী হরবাবুকে জক দিয়ে বলে—'আপনার হিসেবটা দেখে নেন হরবাবু। গত মাসে আপনি একশ বাহাত্তর টাকা বিরাশি পয়সার জিনিষ নিয়েছেন।'

হরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, মুদীর দোকানের হিসেব তিনিও নোট বইতে লিখে রাখেন। তাঁর হিসেব মতো মোট বাষট্টী টাকা পনের পয়সা হয়েছে। কিন্তু কারোও মুখের ওপড়ে পষ্ট কথা বলতে তার বড় কষ্ট হয়।

তাই বললেন—'আচ্ছা দেবোখন। কয়েক দিনের মধ্যেই দেবো।'

বাজার থেকে ফিরে রান্না-বান্না করে খেতে গিয়ে ভারী অসুবিধে হল আজ। বাসন-পত্র নেই, বাজার থেকে মেটে হাঁড়ি আর কলাপাতা এনেছেন। মেটে হাঁড়িতে কোনও ক্রমে সেদ্ধভাত করে কলাপাতায় খেয়ে ইস্কুলে চললেন। তিনি অঙ্কের মাস্টারমশাই।

বাজার হাটে পথে ঘাটে রাজ্যের ভিখিরি। আজকালকার ভিখিরিরাও ভারী ত্যাদোর। বেশীর ভাগ লোকই ভিক্ষে-টিক্ষে দেয়না একটা, যারা যা দেয় তাও দু-একপয়সার বেশী নয়। কিন্তু হরবাবুর কথা আলাদা। ভিখিরিরা তাঁকে দেখলেই সব নেচে ওঠে। পাঁচ দশ পয়সা দিলে ভারী চটে যায় ভিখিরিরা। একবার একটা বুড়ো ভিখিরিকে মাত্র দশ পয়সা দিয়ে ছিলেন তিনি তাতে চটে উঠে পয়সাটা

ফেরৎ দিয়ে বলেছিল—'এঃ, দশ পয়সা দিয়েছ! কেন, আমরা কি ভিখিরি নাকি?'

তাই বাধ্য হয়েই হরবাবুকে চার আনা আট-আনা দিতে হয়। তাতে খুশী না হয়ে ভিখিরিরা এক টাকা দুটাকা চাইতে থাকে। হরবাবু খুবই রেগে যান। কিন্তু কী আর বলবেন!

ইস্কুলের ছেলেরাই কি কিছু ভাল?

হরবাবু ক্লাসে যাওয়ার আগে থেকেই ক্লাস সিক্সের ছেলেরা হাল্লা-চিল্লা করছিল। কিছু ছেলে গল্পের বই পড়ছে, কেউ কাটা-কুটি খেলছে, চেঁচিয়ে গল্প করছে, কিছু বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হরবাবু ক্লাসে ঢুকতেই হাল্লা দ্বিগুন বেড়ে গেল। হাতা-হাতি চলছে, চেঁচামেচি হচ্ছে, এমন কি ক্লাসের পিছন দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় কাগজ পাকিয়ে বল বানিয়ে কয়েকটা ছেলে ফুটবলও খেলছিল, হরবাবুকে কিছু না বলেই কয়েকজন জল খেতে বা বাথরুমে চলে গেল।

হরবাবু কোন দিকে নজর দিলেন না! ব্লাকবোর্ডে একটা অংক দিয়ে মিন মিন করে বললেন— 'কষে ফেল, গোল কোর না।'

সে কথা কারো কানেই গেলনা। হরবাবু বিরক্ত হয়ে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলেন। ছেলেগুলো যে কেন এত গণ্ডগোল করে? খানিক বাদে উঠে তিনি আপন মনে ব্লাক-বোর্ডে অংকটা কষে দিয়ে বললেন—'টুকে নাও সব।'

কেউ টুকল না।

হরবাবু কোন ছাত্রকে কখনো মারেননি, বকেন নি, কাউকে উপদেশ পর্য্যন্ত দ্যাননি। পরিক্ষার সময়ে তিনি যে ঘরে গার্ড দেন সে ঘরের ছেলেদের—পোয়া বারো, আজ পর্য্যন্ত কারও টোকা ধরেননি হরবাবু। চোখে পড়লেও অন্যদিকে চোখ ফিরিয়েনেন তাড়াতাড়ি।

অন্য মাস্টার মশাইরা হরবাবুকে নিয়ে ইয়ার্কি, ঠাট্টা, মস্করা করেন। হরবাবু চুপ করে হাসিমুখে সব শোনেন, কারো কথার উপর কথা বলেন

না। আবার গোপনে অনেকেই তাঁর কাছ থেকে ধার কর্জ্জ নেন। শোধ না দিলেও হরবাবু কিছু বলতে পারেন না।

ইস্কুল থেকে ফেরার পথে কালিবাড়ির গলিতে একটা পেল্লায় ষাঁড়ের মুখোমুখি পড়ে গেলেন হরবাবু। পাশ দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। কিন্তু বজ্জাত ষাঁড়টা কাছে এসে যেন ইয়ার্কি করতেই একবার মাথা নাড়া দিল, ডান পাঁজরে ষাঁড়ের শিংটা পট্ করে লাগতেই যন্ত্রনায় কঁকিয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু ষাঁড়টাকে কিছুই বলেননা।



[ঠিক এই সময়ে……যা আছে দিয়ে দিন]

তালপুকুরের পাশ দিয়ে আসবার সময়ে একটা রাস্তার কুকুর খুবই অভদ্রভাবে হরবাবুর দিকে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এল। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে এলেন। কুকুরটাকে ধমকও দিলেন না।

সন্ধ্যার পর হরবাবু একটু বেড়াতে বেরোন, রোজ কার অভ্যাস।

বেড়াতে বেড়াতে একেবারে নির্জন নদীর ধারে চলে এলেন। খুব জোৎস্না, প্রকাণ্ড আকাশ, বিশাল শুন্যতায় তিনি বিভোর হয়ে গেলেন। কী আনন্দই যে হচ্ছে। কত আনন্দ আর শান্তিই না চারিদিকে।

ঠিক এই সময়ে কোত্থেকে একটা বিশাল চোয়াড়ে চেহারার লোক সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল 'যা আছে দিয়েদিন।'

লোকটার হাতে প্রকাণ্ডএকটাছোড়া। হরবাবু ভীষণ বিরক্ত হলেন। এই সন্ধে বেলার আনন্দটা কেউ মাটি করলে তিনি অসম্ভব চটে যান।

দেওয়ার মত কিছু নেইও। কাল রাতে সব চুরি হয়ে গেছে। হরবাবু মিন মিন করে লোকটাকে বললেন—'দিচ্ছি। তবে গোল কোরোনা। এখন গোলমাল করলে আমার ভারী অসুবিধে।'

বলে পকেটে টাকা পয়সা যা ছিল সব দিয়ে দিলেন লোকটাকে। লোকটাও হরবাবুর অবস্থা বুঝে বেশী ঘাটাল না, শুধু পকেট থেকে কলমটা টেনে নিয়ে গেল। যাক। হরবাবু আবার চারিদিকের গভীর নির্জ্জন আনন্দে ডুবে গেলেন।

বেশ কেটে যাচ্ছিল সময়টা। কিন্তু হটাৎ একটু দূর থেকে একটা প্রবল 'চ্যাচানী উঠল—'বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেললে!'

মনোযোগটা ছিন্ন হওয়ায় খুবই রেগে গেলেন হরবাবু এসব কী? এমন সুন্দর জ্যোৎস্না রাতে একা একটু নির্জনে বসে থাকবেন তার জো নেই?

প্রথমটায় চুপ করেই ছিলেন হরবাবু। কিন্তু আবার শুনলেন একটা মেয়ে 'বাঁচাও!' বাঁচাও,!' বলে চেচাচ্ছে আর অন্য একটা হেঁড়ে গলা ধমকাচ্ছে —'চুপ! শব্দ করলে মেরে ফেলব।'

না, এর একটা বিহিত করা দরকার। একটু নির্জনে বসে থাকতে পারবোনা—এটা কেমন বিশ্রী ব্যাপার! এই ভেবে হরবাবু উঠে পড়লেন।

চাঁদ মারীর ঢিবিটা পার হয়ে হরবাবু দেখতে পেলেন একজোড়া স্বামী স্ত্রী আর একটা বাচ্চা অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় বেড়াতে বেড়িয়েছিল। তাদের সামনে সেই প্রকাণ্ড চেহারার চোয়াড়ে লোকটা ছোড়া হাতে খুব আস্ফালন করছে।

হরবাবু দাঁতকড়মড় করেন—ছিনতাই করছিস কর, তা বলে চেঁচামেচি করে লোকের শান্তি নষ্ট করবি? এমন দুধ জ্যোৎস্নার রাতটা মাটি করে দিবি? লোককে একটু ধ্যানস্থ হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে দিবি না?

হরবাবু বেগে হেঁটে গিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে ধমক মেরে বললেন,—'পেয়েছিস কি তুই? অ্যা? পেয়েছিসটা কি? একবার বলেছিনা, গোলমাল করিস না!'

লোকটা ছোড়াটা নেড়ে রক্ত চোখে চেয়ে বলে, 'জান নিয়ে নেব। ভাগো হিঁয়াসে!'

—'বটে! তবু গোলমাল করবি? চেঁচাবি? বলতে বলতে হরবাবু চড়াং করে একটা চড় কসলেন লোকটার গালে। আর সেই চড়ে লোকটা হতবম্ব হয়ে গেল।

হরবাবুর তাতে রাগ গেলনা। আর একটা চড় কষালেন। লোকটার হাত থেকে ছোড়া খসে গেল। লোকটা গাল চেপে উবু হয়ে বসে 'বাপরে! মারে!' বলে চ্যাচাতে লাগলো।

কিন্তু হরবাবু তাতে আরো খেপেগেলেন। 'মার খাচ্ছিস' তবু চেঁচাচ্ছিস?'

হরবাবু লোকটার ঘাড় ধরে তুলে কিল চড় রদ্দা মারতে মারতে আর বকাবকি করতে করতে একেবারে রাস্তায় তুলে দিয়ে এলেন। বললেন—'ফের এদিকে আসবি তো খুন করে ফেলবো!'

ফিরে এসে হরবাবু আবার হাসি-হাসি মুখ করে জ্যোৎস্না রাতের রহস্য উপভোগ করতে লাগলেন।

সাত — হত্যাকারীর সন্ধানে বিজ্ঞানী

নির্মল কান্তি ঘোষ

তখনো ভালো করে ভোর হয়নি। ডঃ রায়ের হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যায়। তিনি চোখ মেলে বাইরের দিকে তাকান। একটা পাতলা অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

ডঃ রায় আবার চোখ বোজেন। তিনি পাশ ফিরে ফের শোবার আয়োজন করেন। আবার ঘুমিয়ে পড়লেও তাঁকে বিন্দুমাত্র দোষ দেওয়া যাবে না। রিসার্চের ব্যাপারে তাঁর দারুণ পরিশ্রম যাচ্ছে। গতকালও রাত দুটো পর্যন্ত তিনি ল্যাবরেটরিতে ছিলেন।

হয়তো ডঃ রায়ের একটু তন্দ্রার মত এসেছে। ঠিক তখনই তাঁর তন্দ্রাটা কেটে গেল। চোখ মেলে তাকালেন। আবার বুজলেন। ভাবলেন, তিনি হয়তো ভুল শুনেছেন। তবু এ মুহূর্তে নিজের কানকে অবিশ্বাস করতে তার বাঁধছে।

এখন চারদিক কিছুটা ফর্সা হয়েছে। পুবদিকে লালের আভা। সূর্য ওঠার স্পষ্ট ইঙ্গিত।

—বাঁচাও!

ডঃ রায় এবার আর কিছুতেই বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলেন না। তিড়িং করে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। ভাবলেন,

এমন একটা আওয়াজ কোত্থেকে এলো। তার উপর এই ভোর বেলায়।

ডঃ রায় ভাবেন, এ শুধু আওয়াজ নয়, এর মধ্যে যেন জানাচ্ছে, কেউ তাকে হত্যা করছে। বাঁচাও! বাঁচাও!

ডঃ রায়ের ল্যাবরেটরির পাশে কিছুটা জমি। ওখানে কাঠা পাঁচেকের মত জমি খালি পড়ে রয়েছে। কোন কলিয়ারির ম্যানেজার নাকি কিনেছেন। বাড়ি আর তৈরি করছেন না।

ডঃ রায়ের মনে হয়, আওয়াজটা ওদিক থেকে আসছে। কারণ ওখানে মাঝে মধ্যে গণ্ডোগোল হয়। আবার মিটেও যায়। সেই গণ্ডোগোল ফুটবল-ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু যেদিন বোম্ পড়লো সেদিন তিনি রীতিমতন চমকে উঠেছিলেন। ভেবেছিলেন, থানায় যাবেন। তারপর আর কী ভেবে যাননি। এরপর এ ঘটনাটা ঘটলো।

ডঃ রায়ের পরনে পাজামা আর গেঞ্জী। তিনি হাত বাড়িয়ে বিছানার উপর থেকে স্লিপিং গাউনটা তুলে নিয়ে শরীরে কোন রকমে জড়িয়ে নেন। আর দেরী করার সময় নেই। তারপর পায়ে স্লীপার পরে বেড়িয়ে পড়েন।

ডঃ রায়ের চোখে এখনো ঘুমের রেশ। তা পুরোপুরি কাটেনি। তবু তিনি নিজেকে সজাগ রাখেন।

বাতাসে হিমের পরশ। শীতের আগমন বার্তা ঘোষণা করছে। দেবদারু, বট, অশ্বত্থ গাছে পাখিদের জটলা, ডানা ঝাপটানো এবং একটানা কিঁচির মিচির শব্দ ভেসে আসছে।

ছাত্র অবস্থায় ডঃ রায় ভোরেই উঠতেন। এ অভ্যেস তাঁর বাবা করিয়ে গেছেন। তবে এখন আর পারেন না। কারণ অনেক রাত পর্যন্ত তাঁকে জেগে থাকতে হয়। ভোরে ওঠার মত শরীরের অবস্থা থাকে না। এক আধদিন উঠে দেখেছেন। বড় ক্লান্ত বোধ করেন।

ডঃ রায় সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে প্রথমেই সেই ছোট মাঠে এসে

দাঁড়ান। তাঁর অনুমান মিথ্যে নয়। সঠিক জায়গায় তিনি এসেছেন। তবে এখানে হাজির হয়ে যা দেখলেন। তাতে তাঁর চক্ষু স্থির। বুকের স্পন্দন যেন নিমেষের মধ্যে থেমে গেল।

ডঃ রায় নির্দিষ্ট জায়গার কাছে ছুটে যান। ভাবেন, এ কী তিনি দেখছেন? হায় ভগবান! মানুষ এমন নৃশংস হয় কী করে? এরাই নাকি ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব। জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে সবার উপরে। কিন্তু এ মুহূর্তে পশু আর মানুষে কোন তফাত বুঝতে পারলেন না।

ডঃ রায় দেখতে পান, একটা মানুষ পড়ে রয়েছে। তার দেহ থর থর করে কেঁপে চলেছে। তার মাথাটা কাটা। সম্পূর্ণ নগ্ন। সারা শরীরে একটা সুতোর আঁশ ও নেই। এবং ক্ষত স্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে জায়গাটা স্যাঁত স্যাঁতে করে তুলেছে।

ডঃ রায় চারদিকে তাকান। না। কাটা মাথাটা কোথাও দেখতে পান না। অবশ্য ভালো করেই জানতেন, পাবেন না। পেলে খুনী অসুবিধেয় পড়ে যাবে। মৃতদেহ সনাক্ত হয়ে পড়বে। অপরাধী ধরা পড়ার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে। তবু তিনি আর কয়েক বার মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি বোলালেন। না, দেখতে পেলেন না।

ডঃ রায়ের মাথা ঝিমঝিম করছে। রক্তের চাপ অনেক উপরের দিকে। স্বাভাবিক হতে পারছেন না। অথচ এখুনি কিছু একটা করা দরকার। এমন একটা পৈশাচিক কাণ্ডের পর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না! একবার থানায় ফোন করা দরকার। ব্যাপারটা না জানানো পর্যন্ত স্বস্তি বোধ করছেন না।

তাছাড়া, ডঃ রায়ের কাছে এটা একটা দারুণ সুযোগ এসেছে। এ সুযোগ তিনি হাত ছাড়া করতে চাইছেন না। উত্তেজনায় সারা শরীর তাঁর দুলছে।

এখান থেকে লালবাজার বেশী দূরে নয়। গাড়ি নিয়ে বেরুলে মিনিট পাঁচেকও লাগবে না। তবু তিনি ওখানে না গিয়ে এক রকম

দৌড়ে ল্যাবরেটরিতে এসে রিসিভার তুলে ডায়াল করতে থাকেন। অথচ এখন অনেকেই থানা পুলিশের ঝামেলা এড়িয়ে চলেন। কিন্তু তিনি রিসার্চের কথা ভেবে কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারছেন না।

—হ্যালো রিসিপশন।

—আমি কোন্ অফিসারের সঙ্গে তথা বলতে চাই।

—কি ব্যাপারে?

—একটা মার্ডার হয়েছে।

—কখন?

—এই তো একটু আগে।

—আপনি নিজে দেখেছেন?

—হ্যাঁ এবং দেখেই ফোন করছি।

—আপনার-নাম?

—বিজ্ঞানী পরেশ রায়।

—গুড মর্নিং স্যার! পরেশ রায় বিশেষ পরিচিত ভারত খ্যাত বৈজ্ঞানিক হিসেবে।

—মর্নিং। এখুনি আপনাদের দলবল নিয়ে আসতে বলুন। দেরি করলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে।

—ক্ষতি? কিসের?

—রিসার্চের।

—আমি এখুনি ম্যাসেজটা পাঠাচ্ছি। আর আপনার গলা পরিচিত মনে হওয়ায় কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইলাম।

— ঠিক আছে। হাতে কিন্তু বেশী সময় নেই। দেরী করলে···।

—না, না, স্যার, দেরি হবে না।

—আমি ল্যাবরেটরিতেই আছি।

—আচ্ছা স্যার।

—ডি. সি.র সঙ্গে কথা বলার কি কোন দরকার আছে?

—না, না, আমিই জানিয়ে দিচ্ছি।

—ভুলে গেলে কিন্তু……।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আপনার নামে ফাস্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট করিয়ে দিচ্ছি।

—ধন্যবাদ! আপনার নামটা ?

—অলক সাহা।

—ঠিক আছে। ছাড়ছি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ডঃ রায় হাত ঘড়ির দিকে তাকান। ইতিমধ্যে চার পাঁচ মিনিট সময় পার হয়ে গেছে। আর বেশীক্ষণ তাঁর পক্ষে দেরি করা সম্ভব নয়। তাঁর হাত নিস্‌পিস্ করতে থাকে। এমন একটা সুযোগ যদি হাত ছাড়া হয়ে যায় তাহলে সারা জীবন তাঁকে হাত কামড়াতে হবে। অনুশোচনা করতে হবে জীবন ভোর। এমন গলা কাটা মানুষ হয়তো আর পাবেন না। পেলেও তা কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রয়োজন। অবশ্য এ ধরনের দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়বার ঘটুক তা তিনি চান না। কারণ তিনি একটু নরম স্বভাবের মানুষ।

ডঃ রায়ের মনের জোর সাংঘাতিক। অনেক অসম্ভবকে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সম্ভব করেছেন। যাতে হাত দিয়েছেন তা না করা পর্যন্ত তাঁর চান খাওয়া-দাওয়া হতো না। রাত দিন শুধু খেটে চলতেন, যা এখনো করেন। আসলে এসব ব্যাপার তাঁর কাছে একটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গেছে।

ডঃ রায়ের এখন সবচেয়ে বেশী দরকার ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জ যন্ত্রে ব্যাটারি লাগিয়ে নেওয়া। হ্যাঁ, ওটা তো তাঁর বাঁদিকের টেবিলে রয়েছে। ছুটোই প্রায় একই সঙ্গে পেয়ে গেলেন। যন্ত্রের মত দ্রুত হাত চললো।

তারপর ডঃ রায়ের প্রয়োজন ফ্যাণ্টম ক্যামেরা। ওটা তো তিনি পাচ্ছেন না। অথচ গতকাল রাতেও ডান দিকের বড় টেবিলটার উপরে ছিল। তিনি নিজে দেখেছেন। ভৌতিক ব্যাপার নাকি! এটা না পেলে কোন কাজই হবে না। তিনি বেশ উত্তেজিত।

ডঃ রায় তাঁর কাজের লোক রতনকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছেন, আমার কাজের কোন জিনিসে হাত দিবি না। যেটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। তোকে গোছাতে হবে না।

ডঃ রায় রতনকে ডাকতে গিয়েও ডাকেন না। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, কাল দুপুরের পর রতন এখানে ঢোকেনি। কারণ কাল বলতে গেলে সারাক্ষণই তিনি এখানে ছিলেন।

ডঃ রায় রতনকে ইচ্ছে করেই ডাকতে চান না। ডাকলে ও হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেবে। খোঁজা-খুঁজি করতে গিয়ে হয়তো এটা ওটা ভেঙে বসবে। কিন্তু ফ্যান্টম ক্যামেরাটা যে তাঁর চাই।

এরপর ডঃ রায় ভাবেন, ক্যামেরাটা হয়তো হারিয়ে গেছে। আর পাওয়া যাবে না। তবু তিনি ভেঙে পড়তে চান না। কিন্তু কথাটা আবার মন থেকে ছেটে ফেলে দিতেও পারছেন না। এর যে একটা সঙ্গত কারণ নেই তা নয়।

প্রথমত, ডঃ রায়ের বাড়ির ঠিক পাশেই খুন হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ হত্যা করার সময় সে ত্রাহি রবে চিৎকার করবেই। এ ক্ষেত্রেও তা করেছে। এবং সে চিৎকার তাঁর কাছে পৌঁছেছে।

তৃতীয়তঃ, চিৎকার শুনে ডঃ রায় প্রাথমিক কাজ সেরে ক্যামেরার খোঁজ করবেন। করেছেনও। সেটা পেয়ে গেলে তিনি তাক্ লাগিয়ে দেবেন। তাই ওটাকে সরিয়ে ফেলতে পারলে……।

ডঃ রায় ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছেন। নিজের হাত যেন তাঁর নিজেরি কামড়াতে ইচ্ছে করছে। আর শুধু একটা সুযোগ……। হায় ভগবান! এ কাজটা করার পর তাঁর যদি মৃত্যু হয় তাও শত গুণে শ্রেয়।

—আরে! ঐ তো ক্যামেরাটা রয়েছে! ডঃ রায় নিচু হয়ে র‍্যাকের দিকে তাকাতে ক্যামেরাটা দেখতে পেলেন এবং কথাটা নিজেই বলে উঠলেন।

এখন ডঃ রায়ের ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। যাক্, পেয়ে যখন গেছেন

তখন আর ভাববার কোন কারণ নেই। তিনি ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে থাকেন। এবং ঘন ঘন কব্জি উল্টে হাত ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন।

এখন আবার ডঃ রায়ের আর এক চিন্তা, পুলিশ বেশী দেরি করবে নাতো? করলে মহা সর্বনাশ। অথচ বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করাও সম্ভব নয়। অন্য কারুর কথা তিনি জানেন না, নিজে অন্তত করেন না। মনে প্রাণে এটাকে তিনি ঘৃণা করেন। চিরদিন ন্যায়, নীতি মেনে চলেছেন। সেই সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা। এ শিক্ষা তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন।

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় একটু আগের ক্যামেরাটা পাওয়ার আনন্দ যেন এক ফুৎকারে মিলিয়ে যায়। তিনি অল্প অল্প ঘামছিলেন। এখন দরদর করে ঘামতে থাকেন।

ডঃ রায় ভাবেন, মৃতদেহটা ওখানে পড়ে রয়েছে তো? না মুণ্ডটার সঙ্গে ওটাও উধাও হয়ে গেছে? যার জন্য এত তোড়জোর সেটা আছে কী না দেখা দরকার।

ডঃ রায় বিরাট ভুল করেছেন। এমন অবুঝের মত কাজ করা তাঁর মত লোকের পক্ষে আদৌ উচিত হয়নি! ওখানে না হোক একটু তফাতে রতনকে বুঝিয়ে স্থঝিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে এদিকটা তাঁর সামলানো উচিত ছিল। ছি, ছি, এমন একটা কাজ তিনি কী করে করলেন!

কেসটা যখনই ডঃ রায় হাতে নিয়েছেন তখনই খুনী নিশ্চয়ই সতর্ক হয়ে উঠেছে। নিজের বিপদের কথা চিন্তা করে লাশ সরিয়ে ফেলা আশ্চর্য্যের কিছু নয়, আর যারা এসব করে তাদের পক্ষে এ কাজ অতি তুচ্ছ। নস্যি। সরাতে গেলেও কোন ঝামেলা নেই। বিপদে পড়ার সম্ভাবনা কম। কোন রকমে চাপা-চুপি দিয়ে নিতে পারলেই হলো। কারণ চেঁচাবে নাতো।

ডঃ রায় চিরদিন সত্যের সাধনা করেছেন। এসব দিকে তাঁর মাথা খেলে না।

ডঃ রায় তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সেই ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকালেন। কিছু দেখতে পেলেন না। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়েও নয়। এবার তিনি দোতলায় উঠে এলেন। নিশ্বাসের সঙ্গে যেন পাল্লা দিতে চাইছেন।

যাক্, ডঃ রায়ের ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়লো। হ্যাঁ, মৃতদেহটা ওখানে পড়ে রয়েছে। ওর পাশে চাপ চাপ রক্তের দাগ। রক্ত জমে গিয়ে জায়গাটা কালো আকার ধারন করতে শুরু করে দিয়েছে।

ডঃ রায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তর তর করে নিচে নেমে এলেন। বাড়িতে এখনো প্রাণের সাড়া নেই। ঘুমোক ওরা প্রাণ ভরে। প্রথম প্রথম বলতেন। কোন কাজ হয় না দেখে আর কিছু বলেন না।

ইতিমধ্যে একটা গাড়ির শব্দ হতে ডঃ রায় যুবার মত দৌড়ে গিয়ে সদর দরজার কাছে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। হ্যাঁ, পুলিশ সদল বলে হাজির। তাঁর কথা ওরা রেখেছে।

—চলুন আমার সঙ্গে, ডঃ রায় ও. সি. র কাছে গিয়ে বলেন। আমি আপনাদের স্পটে নিয়ে যাচ্ছি।

—চলুন স্যার, ও. সি. ভালো করে ডঃ রায়কে চেনেন। তাঁর সঙ্গে তিনি সমীহ করে কথা বলেন, যা পুলিশ লাইনে বড় একটা দেখা যায় না।

ওদিকে ডঃ রায় ঘন ঘন হাত ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। হ্যাঁ, হাতে এখনো কয়েক মিনিট সময় আছে। তবে আবার বেশী দেরি করাও সম্ভব নয়।

—আপনাদের যা করার দয়া করে তাড়াতাড়ি করুন, ডঃ রায় তাড়া দেন।

—হ্যাঁ স্যার।

—হাতে কিন্তু সময় বড্ড কম।

—কেন বলুন তো ?

—সেটা আপনাকে এখন বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।

—ও! ও. সি. একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। কারণ এ ধরনের কথা শুনতে তাঁরা অভ্যস্ত নন।

—আপনাদের আসতে দেরি হলে আমি নিজেই কাজে লেগে যেতাম।

—আপনি ?

—হ্যাঁ।

—কোন কাজে ?

—ছবি তোলার।

—হুঁ।

—কিন্তু এ ছবি দিয়ে আপনি কী করবেন ?

—আমার রিসার্চের কাজে লাগবে।

—রিসার্চের ?

—হ্যাঁ পরে আপনাকে সব বুঝিয়ে বলবো, বলে ডঃ রায় তাঁর যন্ত্রপাতি ঠিক করতে থাকেন।

—যে জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না তার রিসার্চ করে আপনি তার কী করবেন ? আমার মাথায় তো আসছে না।

একটু থেমে কি মনে হতে ও, সি, ফের বললেন, আগে আপনি বরং ছবিটা তুলে নিন।

—থ্যাঙ্ক ইউ অফিসার।

তারপর ছবি তোলার কাজ হয়ে যেতে ডঃ রায় বললেন, এবার আপনাদের কাজ শুরু করে দিন।

—হুঁ।

এরপর আরম্ভ হয়েছিল পুলিশের তরফ থেকে নানা অনুসন্ধান পর্ব, কিন্তু কোন কিছুরই সুরাহা হয়নি। সবই ব্যর্থ হয়েছে। পোষ্ট

মার্টম, ফিঙ্গার প্রিণ্ট, কুকুর ইত্যাদিও কোন কাজে লাগেনি। শুধু জানা গেছে একটাই জিনিস, তা হলো মৃতের বয়স। তার বয়স সম্ভবত সাতাশ আঠাশের মধ্যে হবে।

খুনী যে চতুর সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডুটা সরিয়ে ফেলেছে। তাহলেই চিনতে পারা যাবে না। অর্থাৎ সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

এ ছাড়া, নিহত ব্যক্তির গায়ে কোন জামা-কাপড় ছিল না। সে ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

আরো একটা জিনিস ডঃ রায় প্রথমটা লক্ষ্য করেননি তা হলো, মৃতদেহের হাতের দুটো বুড়ো আঙুল কাটা ছিল। কেটে নেওয়ার ফলে পুলিশ তার আঙুলের ছাপ নিতে পারবে না।

ওদিকে পুলিশ কুকুর একটা পুকুরের কাছে থেমে গেছিল। পায়ের ছাপ পেয়েছিল। তবে তেমন স্পষ্ট নয়। খুনী এখানে হয়তো হাত-পা ধুয়েছিল। কিন্তু মোদ্দা কথা হলো, পুলিশ হত্যা-কাণ্ডের কোন কিনারা করতে পারেনি।

এর মাঝে আট দশ দিন পার হয়ে গেছে। পুলিশ আর চুপ করে বসে থাকতে পারছে না। উপর থেকে চাপ আসছে। খবরের কাগজগুলোও ছেড়ে কথা বলছে না।

তারপর একদিন পুলিশের দু'জন পদস্থ গোয়েন্দা অফিসার ডঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি তাঁদের সাদর আহ্বান জানালেন।

—আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম, মিঃ সোম বললেন।

—"আরে না, না, বিরক্তর কি আছে" ডঃ রায় বললেন।

—কিছু বার করতে পারলেন?

ডঃ রায় সে কথার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনাদের তরফে কি খবর?

—আশাপ্রদ নয়।

—যাকে খুন করা হয়েছে তার পরিচয় বার করতে পেরেছেন ?

—না।

—মিসিং স্কোয়াড কোন খবর দিতে পারছে না ?

—উহুঁ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি মিঃ সামন্ত জানালেন, তবে নিহত ব্যক্তি এখানকার লোক নয়।

—আপনার ছবির ব্যাপারে……, মিঃ সোম কথার মাঝে থেমে যান।

—আমাদের এই ব্যাপারেই আপনার কাছে আসা, মিঃ সামন্ত একটু দ্বিধার সঙ্গে কথাটা বললেন।

ডঃ রায় কোন কথা বললেন না। শুধু ওদের কথা শুনে যাচ্ছেন। তবে মাঝে মাঝে কার্ডে কতগুলো নম্বর লিখছেন। এরপর তিনি সরাসরি ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু আমার কাছে কেন ?

—মানে শুনেছি, আপনার রিসার্চের বিষয়টা, মিঃ সোম একটু ইতস্তত করে বললেন। গাছপালা নিয়ে এ ধরনের রিসার্চ চলছে, কিন্তু মানুষের মাথা কেটে নিলে তা কী করে সম্ভব !

—সম্ভব, ডঃ রায় জানালেন। আর অসম্ভবকে সম্ভব করাই তো বিজ্ঞানীদের কাজ।

ত্ব'জন ত্ব'জনের দিকে তাকালেন। তাঁরা যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

তারপর ডঃ রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার কাজ শেষ।

—শেষ ? ত্ব'জণেই প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলেন। কথাটা যেন ওরা বিশ্বাস করতে বাধ্য নন। কিন্তু ত্ব'জনেই আনন্দে আত্মহারা।

—হ্যাঁ এবং আজকেই করেছি। বিশ্বাস হয় কি না দেখুন

কথা শেষ করে ডঃ রায় একটা ড্রয়ার খুলে বড় খাম বার করলেন। তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নেগেটিভটা টেনে আনেন।

রাখলেন সেটা গ্লাস কেসে, এরপর আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিস্ময়কর মুহূর্ত এসে গেল। ফুটে উঠলো, মাটিতে শোয়া অবস্থায় মাথা সহ একটা নগ্ন দেহের চিত্র।

ওরা অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, এও সম্ভব? তাঁরা যেন নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ডঃ রায় শুধু মাথা নেড়ে বললেন, কাল এসে এর পজিটিভ প্রিণ্ট নিয়ে যাবেন।

—আচ্ছা।

এরপর ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলে। তবে স্থানীয় থানা ঐ যুবকের ব্যাপারে কোন খবর দিতে পারলো না। তারপর সমস্ত থানায় ছবি পাঠানো হলো। কয়েক দিন পরে খবর এলো হাওড়া জেলার বালি থানা থেকে। নিহত যুবক ঐ অঞ্চলের লোক, দাগী আসামীর খাতায় তার নাম ধাম পরিচয় সব আছে।

পুলিশ বাড়িতে গিয়ে যুবকের বুড়ো বাবাকে পেল। সে জানায়, ছেলে এক মাসের জন্য বাইরে গেছে। তবে কোথায় গেছে তা সে জানে না। এরকম প্রায়ই হয়। তাই সে অত চিন্তিত নয়।

তারপর আরো জানা গেল, খুনী হত্যা করার উদ্দেশ্যে যুবককে বালী থেকে বালীগঞ্জে নিয়ে আসে। নিজেদের মধ্যে কি একটা গোলমালের জন্য এই শোচনীয় পরিণতি। এরপর অনুসন্ধান পর্ব চালিয়ে সাঙ্গপাঙ্গদের ধরতে পুলিশদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

পরের দিনই খবরের কাগজে লোমহর্ষক কেসের বিবরণ দিয়ে ডঃ রায় সম্বন্ধে নানা কথা লেখা হলো। এরপর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে বলা হলে তিনি বলেন—এই ইলেকট্রিক ফটোগ্রাফি আবিষ্কার করেন রাশিয়ার বিজ্ঞানী এস. ডিঃ কিরলিয়ান এবং তাঁর স্ত্রী ভ্যালেন্টিনা কিরলিয়ান। যেহেতু এরা আবিষ্কারক, তাই এই আবিষ্কারের নাম রাখা হয় "কিরলিয়ান ফটো গ্রাফী"। এর কিছুদিন পরে আর এক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন, গাছের কোন পাতা বা অংশ ছিঁড়ে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে কিরলিয়ন পদ্ধতিতে যদি ছবি তোলা যায়, তাহলে গাছের পাতা বা ছেঁড়া

অংশের ছবি পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির নাম "ফ্যান্টম লীফ এফেক্ট"। এর আবিষ্কারক হলেন বিজ্ঞানী আদামেস্কো।

এই উপায়ে পরীক্ষা চালিয়ে 'ব্রেজিলের বিজ্ঞানী এইচ. ডি. এণ্টাভ এবং আমেরিকার থেলেমাম মাত্র শতকরা পাঁচভাগ সাফল্য অর্জন করেছেন। তবে এরা কেউ নিজেদের গবেষণার কথা জানাননি। কিন্তু এই অদ্ভুত ফটোগ্রাফির আসল ব্যাপার হলো, চেতন পদার্থের যদি ছবি তোলা হয় তবে অবৈদ্যুতিক ধর্মগুলি একটা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাবে বৈদ্যুতিক ধর্মে রূপান্তরিত হয় এবং পদার্থটির বৈদ্যুতিক আধান পদার্থের নিচে বা উপরে রাখা ফিল্মের উপর সম্পূর্ণ পদার্থের ছবি উঠে যায়।

আসলে প্রতিটি চেতন বস্তুর 'বায়োপ্লাজাম' নামে একটা ধর্ম আছে। এই বায়োপ্লাজমার অসংখ্যা মুক্ত ও আহিত কনাই বস্তুটির নির্দিষ্ট আকার এবং আয়তন রক্ষা করে। চেতন বস্তুর কোন অংশ কেটে ফেলে দিলেও তার চারপাশে বস্তুটির বায়োপ্লাজমা কণাগুলো ফেলে দেওয়া অংশের শূন্যস্থানে পনেরো থেকে বিশ মিনিট অন্তত নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে ভাসতে থাকে।

ইলেকট্রোফটোগ্রাফিতে সঠিক পরিসীমাসহ সেই কণাগুলো আগের মূল প্যাটার্ণ নিয়ে ধরা পড়ে বলেই সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া সম্ভব। তবে কিরলিয়ান পদ্ধতির পুরোপুরি সাফল্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকায় এ নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে।

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যোৎস্না কুমার চ্যাটার্জী এবং তাঁর দুই সহকারী ডঃ প্রকাশ কেজরিওয়াল ও ডঃ আশুতোষ চ্যাটার্জী ফ্যান্টম ফোটো তোলার ব্যাপারে এক বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎ-যন্ত্র আবিস্কার করেন, যা অনেক সহজ সরল।

পরিশেষে ডঃ রায় বলেন, এ ব্যাপারে কৃতিত্ব বলতে গেলে আমার বিশেষ কিছুই নেই। ওঁদের কাছে আমরা ঋনী। তাই বার বার এদের প্রশংসা করলেও ওদের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না।

আট ম্যাজিশিয়ান

বিমল কর

বছর পঁচিশ পরে দেখা। চিনতেও পারিনি।

অশ্বিনীই আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, "কীরে, চিনতে পারছিস? আমি অশ্বিনী।"

মানুষ যে কত বদলে যায়, অশ্বিনীকে না-দেখলে বোঝা মুশকিল। ছেলেবেলার চেহারা বয়সে পালটে যায়। তবু একটা আদল ধরা পড়ে। অশ্বিনীর সবই পালটে গিয়েছে। অনেকক্ষন নজর করে দেখলে হয়তো তার সামনের দাঁত আর কখনও-কখনও চোখের দৃষ্টিতে পুরনো অশ্বিনীকে একটু আধটু ধরা যায়।

অশ্বিনী আমার হাত ধরে টানল। বলল, "আয়। দোকানে আয়। আমি ধুলুর মুখে শুনেছিলাম, তুই আসছিস।"

ধুলু আমার ভাই। নিজের নয়, দূর সম্পর্কের। বয়সে অনেক ছোট। শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপারে ধুলুদের বাড়িতেই এসেছি। দিন-দুই থাকার কথা।

দরজির দোকান দিয়েছে অশ্বিনী। বাজারের মধ্যেই। দোকানের নাম রেখেছে 'মনোরমা'।' ছোট দোকান। সাধারণ ভাবে সাজানো-গোছানো। দোকানের পেছনের দেওয়ালে কাঠের তক্তা দিয়ে বাক্স মতন করে নিয়েছে, সেখানে তার দরজি বসে সেলাই-মেসিন নিয়ে।

অশ্বিনী আমাকে তার চেয়ারে বসাল। নিজে বসল একটা টুলের উপর। বলল "কতকাল পরে তোকে দেখলাম, বিজন। কেমন আছিস বল?"

বলার আর কীই বা ছিল। "চাকরি-বাকরি, ঘর সংসার, ছোট খাট অসুখ-বিসুখ নিয়ে সাধারণ মানুষ যেমন করে বেঁচে থাকে সেই ভাবেই দিন কাটছে।" বললাম অশ্বিনীকে। শেষে বললাম, "তুই কেমন আছিস তাই বল ?"

অশ্বিনী বলল, "আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস। এই দোকান নিয়ে আছি। চলে যাচ্ছে কোন রকমে।" বলে অশ্বিনী উঠল। "দাঁড়া, একটু চায়ের কথা বলে আসি! পাকৌড়া খাবি ? সেই মতিয়ার দোকানের পাকৌড়া। মাতিয়া অবশ্য নেই, তার ভাইপো দোকান চালায়।"

অশ্বিনীকে খুশি করতেই আমি মাথা নাড়লাম। অশ্বিনী চলে গেল।

দোকান ফাঁকা। রাত হয়ে আসছে। যদিও মাসটি ফাল্গুন, তবু কলকাতার মতন গড়ম পড়ে যায়নি। একটু শীতের ভাব রয়েছে।

আমার বারবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল। অশ্বিনী আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে হাই স্কুল পর্য্যন্ত পড়েছি। খেলাধুলো করেছি একসঙ্গে। থাকতামও এক পাড়ায়।

স্কুল ছাড়বার পর থেকে আর তেমন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। আমার বাবা চাকরি থেকে রিটায়ার করে ধানবাদ ছাড়লেন। আমিও ছাড়লাম। মাঝে এক-আধবার দু-এক দিনের জন্য এসেছি হয়ত ধুলুদের বাড়ি, অশ্বিনীকেও দেখেছি, কিন্তু এবার যেন দেখলাম সে-রকম নয়।

ছেলেবেলায় অশ্বিনী ছিল যেমন হুজুগে তেমনি বেপরোয়া। তার বাবা, আমাদের কামাখ্যা কাকা, ছিলেন রেলের ছোট ডাক্তার। দেখতে বড় সুন্দর ছিলেন। বড়দের সঙ্গে থিয়েটারও করতেন। অশ্বিনী অত সুন্দর ছিলনা দেখতে, কিন্তু সুশ্রী ছিল। তার চোখ-নাক ছিল চমৎকার চেহারাটা অবশ্য গনেশ-গনেশ ছিল। অশ্বিনী বেশ শৌখিন ছিল। ফিটফাট প্যাণ্ট-শার্ট পরে স্কুলে যেত। তার

পকেটে পাট করা রুমাল থাকত। আমরা তখন বাচ্চাদের পকেটে রুমাল থাকার কথা ভাবতেই পারতাম না।

অশ্বিনীর ছেলেবেলা থেকেই শখ ছিল ম্যাজিশিয়ান হবে। ধানবাদের রেলবাবুরা পেল্লায় করে যে এক্সিবিশন করতেন সেখানে গনপতির ম্যাজিক দেখার পর থেকেই তার মাথায় এই শখ চাপে। অশ্বিনী বটতলার ম্যাজিক শিক্ষার বই আনিয়ে ম্যাজিক শিখত, আর আমাদের দেখাত।

ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে অশ্বিনী অনেকবার মরতে মরতে বেঁচে গেছে। একবার সে কলা খেয়ে মুখ থেকে ছুঁচ বার করতে গিয়ে মর-মর হয়েছিল। আর-একবার যা করেছিল, আরও মারাত্মক। কাঁচের টুকরো চিবিয়ে খেতে গিয়েছিল। বইয়ে পড়েছিল আদার রসে কাঁচের টুকরো ভিজিয়ে উনুনের পাশে রেখে গরম করে নিলে কাচ হজম করা যায়। সেই কায়দাটা দেখাতে গিয়ে গাল কেটে যায়-যায় অবস্থা হয়েছিল অশ্বিনীর। ছেলেবেলায় এইসব বোকামি সে অবশ্য শুধরে নিয়েছিল, কিন্তু ম্যাজিকের নেশা আর মাথা থেকে যায়নি। আমরা যখন স্কুল ছেড়ে চলে আসি তখন সে অনেক পাকা ম্যাজিশিয়ান; সরস্বতী-পুজোর দিন স্কুলে সে ম্যাজিক দেখাত।

ম্যাজিশিয়ান অশ্বিনী আজ একটা সাদা মাটা দরজির দোকান দিয়ে বসে আছে—এ যেন ভাবাই যায় না। তাছাড়া তার চেহারা? সেই সুশ্রী, সৌখিন অশ্বিনীর আজ কী বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েছে, মুখের কথা জড়ানো, মাথার চুল পাতলা, পোষাক-আশাক ও একেবারে মামুলি। ওকে দেখলে দুঃখই হয়।

অশ্বিনীর কথাই ভাবছিলাম, এমন সময় অশ্বিনী ফিরে এল। হাতে শালপাতার ঠোঙায় পাকৌড়া। বলল "আমি খাবনা, তুই খা। গরম ভাজিয়ে আনলাম। চা আসছে।"

পাকৌড়া খেতে-খেতে আমি বললাম, "তোর এই দরজির দোকান কত দিনের?"

"তা বছর ছয়েক হবে।"

"মনোরমা নাম দিয়েছিস কেন ?"

"আমার মায়ের নাম মনোরমা।"

আমার খেয়াল ছিল না কাকিমার নাম। অপ্রস্তুত হলাম। তার পরই বললাম, "তুই আর কিছু করতে পারলি না ? চাকরি-বাকরি ? অন্য কোন ভাল ব্যবসা ?"

"চাকরি করেছি। ভাল লাগত না। ঝগড়াঝাটি হত। ছেড়ে দিয়েছি।"

"কিন্তু এই দরজির দোকানে তোর চলে ?"

"চলে যাচ্ছে। আমার আর আছেটা কে। মা নেই, বাবা নেই। দিদি ছিল। সেও নেই। আমি একলা থাকি। নিজেই রান্না-বান্না করি খাই।"

এমন সময় চা এল। দেখলাম, অশ্বিনীর জন্যে চা আসে নি। বললাম, "তুই চা খাবিনা ?" "না, তুই খা।"

চা খেতে খেতে আমি হেসে বললাম. "তোর সেই ম্যাজিক ছেড়ে দিয়েছিস ?"

আশ্বনী আমার দিকে তাকাল। পাতা পড়লনা চোখের। একবার যেন দৃষ্টিটা কঠিন ও রুক্ষ হল, তারপর ধীরে-ধীরে সেই কঠিন ও রুক্ষভাব মোলায়েম হয়ে এসে কেমন যেন মলিন হল।

অশ্বিনী বলল, "লোক-দেখানো ম্যাজিক ছেড়ে দিয়েছি।"

কথাটি কানে লাগল। বললাম, "তার মানে ? ম্যাজিক তো লোকেই দেখে।"

"ও ম্যাজিক আর আমি দেখাই না।"

"অন্য ম্যাজিক দেখাস নাকি ?" আমি ঠাট্টা করে হাসলাম, "সেটা আবার কী ?,'

অশ্বিনী ম্লান করে হাসল, কোন জবাব দিলনা কথার চা খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। অশ্বিনী চুপচাপ। আমার কেমন ভাল

লাগছিল না। অস্বস্তি হচ্ছিল। অশ্বিনীর হঠাৎ এমন বোবা হয়ে যাওয়া কেন? সে মাঝে-মাঝেই আমায় কেমন করে দেখছে। তাছাড়া এসে পর্য্যন্ত লক্ষ্য করছি, অশ্বিনী কথা বলার সময় মুখের সামনে রুমাল ধরে রাখছে। কী খারাপ অভ্যেস।

অসহিষ্ণু হয়ে আমি বললাম, "তুই যেন কী ভাবছিস! আমায় অমন করে দেখছিস কেন?...রুমালটাই বা মুখের সামনে ধরে রেখেছিস কেন?"

অশ্বিনী রুমাল সরাল না। আরও কিছুক্ষন চুপচাপ থাকল; তারপর বলল, "তোকে একটা কথা বলতে পারি। বিশ্বাস করবি?"

"কি কথা?"

"শুনলে হাসবি। ভাববি, আমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

আমি হেসে বললাম, "তোর তো প্রথম থেকেই মাথার গোলমাল। ছেলেবেলায় কাঁচ চিবিয়ে খেতে গিয়ে মরতে বসেছিলি, মনে নেই!"

অশ্বিনী হাসির মুখ করল।

আমি বললাম, "তোকে কত বছর পর দেখছি, অশ্বিনী। আমার ভাল লাগছে না। এই দরজির দোকান, তোর চেহারা, চোখ মুখ সব যেন কেমন লাগছে। সত্যি করে বলতো, তোর কী হয়েছে? আমি হাসব না।"

অশ্বিনী বেশ অন্য মনস্ক হয়ে গেল। নিশ্বাস ফেলল বড় করে। তারপর বলল, "তোকে যা বলছি সত্যি করেই বলছি। এক বর্ণও বাড়িয়ে বলছি না। মিথ্যে বলছি না" বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অশ্বিনী বলল, "বছর আষ্টেক আগের কথা। মা বেঁচে আছে। বাবা নেই। তখন আমি একটা চাকরি করতাম। তবে চাকরিতে আমার মন ছিল না। মন ছিল ম্যাজিকে। ম্যাজিকই ছিল আমার ধ্যান জ্ঞান। কত টাকা-পয়সাই না খরচ করেছি ম্যাজিকের জিনিসপত্র তৈরি করতে, সাজ পোষাক বানাতে।

ছোট খাট একটা দলই তৈরি করে ফেলেছিলাম আমি, এ-সব দিকে—মানে তোর কোলিয়ারিতে, মেলায়, রেলের ক্লাবে, চ্যারিটি শোয়ে আমার ডাক পড়ত। দলবল নিয়ে যেতাম। খেলা দেখাতাম। টাকা পয়সাও পেতাম। একবার কাতরাস গড়ে আমাদের ডাক পড়ল। কালীপূজোর সময় খেলা দেখাতে গেলাম দলবল নিয়ে। সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল, তুই চিনবি না, ভজনদার মেয়ে। তার নাম ছিল টুনি। টুনিকে নিয়ে আমরা দু-তিনটে খেলা দেখাতাম। তার মধ্যে একটা ছিল হাসি-হুল্লোড়ের, বড় বেতের টুকরির মধ্যে টুনিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হত—আর চোখের পলকে ভ্যানিশ হয়ে যেত টুনি, তার বদলে টুকরি থেকে এক জোড়া খড়গোশ বেরিয়ে আসত।”

অশ্বিনী কথা বলতে বলতে থামল একবার। বাইরের দিকে তাকাল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, “অন্য দুটো খেলার মধ্যে একটা ছিল, টুনি ছুরি দিয়ে আমার জিব কেটে দেবে, রক্ত পড়বে গলগল করে, আবার কাটা জিব জোড়া হয়ে যাবে। সোজা খেলা। তুইও ছেলেবেলায় স্কুলে যাবার সময় রাস্তার ধারে এই খেলা দেখেছিস—মাদারিরা দেখাত। খেলাটাকে চটকদার করার জন্যে আমি টুনির মতন বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে খেলাটা দেখাতাম। তাকে খুব ভাল করে খেলাটা শিখিয়ে ছিলাম।···সেদিন কিন্তু কী যে হল কে জানে! সহজ খেলা। অজস্রবার দেখিয়েছি। অথচ ওই দিনটাতে সব গোলমাল হয়ে গেল, ভুল হয়ে গেল আমাদের। টুনি আমার আসল জিবে ছুরি চালিয়ে দিল।”

আমি চমকে উঠলাম। বলে কী অশ্বিনী! ওর জিব নেই নাকি? তাহলে কথা বলছে কেমন করে?

আমার অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী বলল, “তুই ভাবছিস আমার জিব কি কেটে ফেলেছিল টুনি? না। সবটা কাটেনি। জিবের একটা পাশ কেটে গিয়েছিল; তাতেই যা রক্ত

পড়েছিল তুই কল্পনাও করতে পারবি না। হাসপাতালেও ছিলাম বেশ কিছু দিন।

স্বস্তির বিশ্বাস ফেলে বললাম, "সেই থেকে ম্যাজিক ছেড়ে দিয়েছিস?

মাথা হেলিয়ে অশ্বিনী বলল, "হ্যাঁ; ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আসল ব্যাপারটাতো তোকে বলিনি এখনও। আমার জিব ধীরে ধীরে আবার আগের মত হয়ে এল খানিকটা, ভাবলাম বেঁচে গেলাম। পরে দেখলাম, জিবটা আগের মতন আর হচ্ছে না। রঙটা দিন দিন কালো হয়ে যাচ্ছে, আর ধারগুলো কেমন গুটিয়ে থাকে কথা বলতে আগে বেশ কষ্ট হত। এখন অনেকটা সামলে নিয়েছি।"

কৌতুহল বোধ করে বললাম, "দেখি তোর জিব?"

অশ্বিনী মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, "দেখানা, কী হয়েছে?"

অশ্বিনী আমার চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "নারে, দেখিস না।"

"কেন?"

"আমার জিব কাউকেই আমি দেখাই না। মা আমার জিব দেখত, মারা গেল। বাজারের দাস ডাক্তার আমার জিব দেখেছিল —সেও মারা গেল। আমার জিব দেখলে খারাপ হয়। আমি কারুর সামনে জিব দেখাই না।"

আমার বিশ্বাস হল না।

তারপরই মনে পড়ল, অশ্বিনী আমার সঙ্গে কথা বলার সময় আগাগোড়া মুখের সামনে রুমাল আড়াল করে রেখেছিল। সে কোন কিছু খায়নি।

অশ্বিনীর কথা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না, আবার কেমন ভয়ও করছিল। অশ্বিনী কার জীব নিয়ে বেঁচে আছে কে জানে! তার, না, অভিশপ্ত কোন জীবের, কে জানে।

নয় পৃথিবীর শেষ দিন

অনীশ দেব

অধ্যাপক বিকাশ সরকার আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। গালের খোঁচা খোঁচা দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'এটাই তাহলে আপনার সেই টাইম মেশিন'?

আমি হাসলাম। বললাম, হ্যাঁ—'

অধ্যাপকের চোখে মুখে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তার ছায়া। জানালা দিয়ে বাইরের সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে আনমনা ভাবে বললেন, 'এই মেশিন কি পারবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে?'

আমি অবাক হয়ে অধ্যাপক সরকারের দিকে চোখ ফেরালাম। কি তাঁর প্রশ্ন? সে প্রশ্ন কি এতোই কঠিন যে সেণ্ট্রাল কম্পিউটার তার উত্তর দিতে পারে না? দেখলাম, অধ্যাপকের চেহারায় ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ। যেন কোন এক সুকঠিন সমস্যা তাঁকে দিনের পর দিন কুরে কুরে খাচ্ছে। আমার নীরবতায় তাঁর ফর্সা কপালে অসংখ্য ভাঁজ পড়লো। স্পষ্ট মৃদু কণ্ঠে তিনি বলতে শুরু করলেন, 'আমি কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষণাগারে ইকোলজি বা বাস্তুবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করি। বর্তমানে আমি ত্রিংশ শতাব্দীতে প্রাণী জগতের অবস্থা নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছি। তখন মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা কি ভাবে বাঁচবে, কি খাবে, কোথায় থাকবে, এসবই আমার চিন্তার বিষয়। তখন হয়তো প্রকৃতি থেকে কোনরকম সাহায্যই আমরা পাবো না। সুতরাং কি কৃত্রিম পথ নেবো আমরা? সেই পথ

জানতে আপনার কাছে আসা। আপনি হয়তো আপনার টাইম-মেশিন দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন—'

'এই টাইম-মেশিনটা সম্পর্কে আপনার আগে জানা দরকার,' রুমালে মুখ মুছে আমি বললাম, 'এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর কল্পিত মেসিনের সঙ্গে এর তফাৎ অনেকখানি। আমার মেশিন শুধু ভবিষ্যতেই অনুসন্ধান চালাতে পারে, অতীতে নয়। কারণ সময় এমন একটা জিনিস যা এক দিকেই এগিয়ে চলে—সামনের দিকে। পেছনে নয় সুতরাং সময়ের এই এগিয়ে চলার এই স্বাভাবিক নীতিকে আমরা ভাঙতে পারি না।'

কথা বলতে বলতে আমি টাইম-মেশিনটার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মেশিনটা দেখতে অনেকটা একটা ডাকবাক্সের মতো। তারই গায়ে বসানো বিভিন্ন সুইচ। আর ডাকবাক্সের ওপর একটা বিরাট প্লাস্টিকের গোলক। ঘরের আলোয় চকচক করছে।

কণ্ট্রোল প্যানেলের একটা স্যুইচে হাত রেখে অধ্যাপক সরকারকে বললাম, 'কোন জিনিসকে ভবিষ্যতে পাঠানোর অর্থ কৃত্রিম উপায়ে মুহূর্তের মধ্যে তার বয়স বাড়িয়ে দেওয়া। অর্থাৎ বয়স বেড়ে যাওয়ার যে 'এজিং প্রসেস', সেটাকে এই মেশিনের সাহায্যে অনুকরণ করা। কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে সেটা জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া, আর জড় পদার্থের ক্ষেত্রে জৈব অথবা অজৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া। যে জিনিসটা আমি ভবিষ্যতে পাঠাবো, সেটাকে আমি ঐ প্লাস্টিকের গোলকে ঢুকিয়ে দিই, তারপর ঐ গোলকের ভেতর কৃত্রিম উপায়ে বায়ুর চাপ বাড়িয়ে জিনিসটাকে ভারশূন্য করে ফেলি ওটা তখন গোলকের ঠিক কেন্দ্রে স্থির হয়ে থাকে। তারপর এই লাল বোতামটা টিপলেই গোলকটা বায়ুশূন্য হয়ে যায় এবং জিনিসটা নীচে পড়ে যাবার আগেই টাইম-মেশিন তার কাজ শুরু করে দেয়। টাইম-মেশিনের কাজ শেষ হলেই গোলকটা আবার বায়ুপূর্ণ হয় ও ভবিষ্যতে পাঠানো রূপান্তরিত জিনিসটা আগের মতোই শূন্যে ভাসতে

থাকে। গোটা পরিবর্তনে সময় লাগে পনেরো মাইক্রো সেকেণ্ড, অর্থাৎ পনেরো সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।'

অধ্যাপক বিকাশ সরকারের চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, 'বায়ু চাপ বাড়িয়ে হঠাৎ গোলকটি বায়ুশূন্য করবার কারণ?'

'কারণ একটা অতি স্বাভাবিক বিপদ এড়ানো।' হেসে বললাম, 'এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ যেটা বলেন নি, তা হলো, যে জিনিসকে ভবিষ্যতে পাঠানো হচ্ছে তার সরাসরি সংস্পর্শে যে সব জিনিস থাকবে, সেগুলোও ভবিষ্যতে চলে যাবে। সুতরাং সরাসরি সংস্পর্শে কোন জিনিসকে না রাখার জন্যই এই বায়ুপূর্ণ ও বায়ুশূন্য করবার ব্যবস্থা।'

অধ্যাপক সরকার টাইম-মেশিনের কাছে এগিয়ে এলেন। কণ্ট্রোল প্যানেলের সুইচ ও বোতামগুলো নিরীক্ষার ভঙ্গীতে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। অবশেষে বললেন, 'কোন উদাহরণ দিতে পারেন?'

'পারি—' বলে অধ্যাপকের বুক পকেট থেকে ফাউন্টেন পেনটা তুলে নিলাম। প্লাষ্টিকের ডোমের তলার দিকের একটা জানলা খুলে সেটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর ইশারায় অধ্যাপক সরকারকে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়াতে বলে বোতাম টিপলাম। একটা ঝিম্ ধরানো ভোমরার গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা গেলো না। একসময় দেখা গেলো ফাউন্টেন পেনটা গোলকের ঠিক কেন্দ্রে শূন্যে ভাসছে।

'এইবার—' বলে পর পর একটা সবুজ ও একটা লাল বোতাম টিপলাম। প্লাস্টিক গোলকের ভেতরকার দৃশ্যের কোন পরিবর্তন হলো না।

প্রফেসর বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'ডঃ প্রসাদ, এ কি ব্যাপার?,

আমি নীরবে বায়ুচাপ কমানোর বোতাম টিপলাম। অধ্যাপক

সরকারের দিকে না ফিরেই বললাম, 'পেনটাকে আমি দশ মাস ভবিষ্যতে পাঠিয়েছি। এবার দেখুন, তখন ওটা কি অবস্থায় থাকবে—' বলে পেনটা ডোম থেকে বার করে প্রফেসারের হাতে দিলাম! উনি ওটা দেখতে লাগলেন। খুঁজতে লাগলেন কোন পরিবর্তন।

আমি বললাম, 'লিখে দেখুন—'

প্রফেসর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে লিখতে গেলেন। লেখা পড়লো না। উনি অবাক চোখে প্রশ্ন করলেন, 'অর্থাৎ দশমাস পর পেনটা কালি শূন্য শুকনো অবস্থায় থাকবে?'

'হ্যাঁ—'

'এটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না?'

'না—কারণ সময়ের প্রবাহ চিরকালই এক মুখী ভবিষ্যতের দিকে। ওটাতে নতুন করে কালি ভরলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এবারে অধ্যাপক খুশী হলেন। প্রশ্ন করলেন, 'আপনার যন্ত্রের ক্ষমতা কতটুকু? কোন জিনিসকে সবচেয়ে বেশি কতোদূর ভবিষ্যতে আপনি পাঠাতে পারেন?

'দেড়হাজার বছর—'

'ডঃ প্রসাদ, এদেশে সাইবারনেটিক্স ও টাইম-স্পেস রিসার্চে আপনার চেয়ে দক্ষ আর কেউ নেই। সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে ঠিক লোকের কাছেই আমি আমার প্রশ্নের উত্তর জানতে এসেছি। এখন আমাকে বলুন ত্রিংশ শতাব্দীতে আমাদের মানব জাতির কি হবে? সেণ্ট্রাল কম্পিউটারকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া গেছে, "প্রদত্ত তথ্য অসম্পূর্ণ"। আপনি হয়তো জানেন, আমাদের পৃথিবী সৌরজগত থেকে দিনের পর দিন যে উত্তাপ নিচ্ছে, তাতে তার এণ্ট্রপি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। স্বল্প সময়ে গৃহীত তাপ ও সেই সময়ে চরম তাপমাত্রার ভাগফলই এণ্ট্রপির পরিমাপ। সুতরাং এই এণ্ট্রপি বাড়তে বাড়তে আমাদের পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে

যাবে।—এটাই বিজ্ঞানীদের অনুমান। একে বলা হয় "হীট ডেথ"। দ্বিতীয় একটি থিওরিও আছে। সেটা হলো সূর্যের তাপ ক্রমশ কমতে কমতে সে একদিন নিভে যাবে। তখন পৃথিবী হয়তো থাকবে, কিন্তু তার সমস্ত প্রাণী ঠাণ্ডায় মারা যাবে। এটাকে বলা হয় "কোল্ড ডেথ"। এখন এই হীট ডেথ বা কোল্ড ডেথ অনুযায়ী মানুষের জীবন ধারণ, আচার-ব্যবহার পালটে যাবে—পাল্টানো উচিত। সুতরাং পৃথিবীর নির্দিষ্ট পরিণতি জেনেই আমি আমার গবেষণার ধারাকে উপযুক্ত দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবো। সো হেল্প মি। এই চিন্তাটাই গত কয়েকমাস ধরে আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। অবশেষে আপনার টাইম-মেশিনের খবর পেয়ে আমি এসেছি। উত্তর আমাকে একটা পেতেই হবে।'

প্রফেসর বিকাশ সরকার থামলেন। তাঁর চোখ-মুখ উত্তেজনায় লাল। কপালের ডান দিকে একটা নীলচে শিরা দপদপ করছে।

আমি তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে সোজা ঘর ছেড়ে বাইরের মাঠে চলে গেলাম। ঘাস সমেত এক খাবলা মাটি তুলে নিয়ে আবার ঘরে ফিরে এলাম। প্রফেসর সরকারের দিকে এক পলক তাকিয়ে ফাউন্টেন পেনের মতো মাটির দলাটাকে প্লাস্টিকের গোলকে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় বোতামগুলো টিপলাম।

মুহূর্তে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো।

মাটির দলাটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে একটা নীলচে আলোর আভা গোলকের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির হয়ে রইলো।

প্রফেসর সরকার চিৎকার করে উঠলেন, 'ডঃ প্রসাদ, এর মানে কি? কতোটা ভবিষ্যতে আপনি ওটাকে পাঠিয়েছেন?'

আমি ক্লান্ত স্বরে জবাব দিলাম, 'মাত্র আশি বছর—'

'তাহলে—তাহলে—' প্রফেসর-এর স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো চাপা উত্তেজনায়।

বললাম, 'ঠিকই ধরেছেন; বাস্তবিদ্যাগত দরকারী তথ্য জানতেই

আমি মাত্র আশি বছর ভবিষ্যতে ওটাকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি এসব চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। এন্ট্রপি সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে ওঠার আগেই আমাদের পৃথিবী ধ্বংস হয়ে রূপান্তরিত হবে শক্তিতে। আপনার গবেষণারও আর কোন প্রয়োজন নেই, প্রফেসর সরকার—'

'কিন্তু—কিন্তু কোন্ কারণে এ পৃথিবী ধ্বংস হবে?' প্রফেসরের অভিব্যক্তিতে অবিশ্বাস।

'এখনও বুঝতে পারছেন না?' হেসে তাঁকে বললাম, 'প্রথম পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধ আমাদের দরজায় টোকা দিচ্ছে—'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই অস্বাভাবিক আলোর এক বিচ্ছুরণ আমাদের অন্ধ করে দিলো। আমরা ছিটকে উঠলাম শূন্যে। চারিদিকে শুধু আলো আর আলো……লক্ষ কোটি সূর্যের কিরণ যেন আমাদের ঘিরে ফেলেছে।

না, টাইম-মেশিন মিথ্যে বলেনি। আশি বছরের জায়গায় তিন মিনিট ভবিষ্যতে পাঠালেও ফলাফল আমরা একই পেতাম।

দশ কিলিং অফ্ ম্যান ইটারস

বুদ্ধদেব গুহ

জীপটা রীতিমত গোঙাতে লাগল। কিন্তু ড্রাইভার সাকির মিয়া ছাড়বার পাত্র নয়। মাংকি-ক্যাপটা ঘাড় অবধি নামিয়ে দু'হাতে ষ্টিয়ারিং-এর কান পাকড়ে বন্ বন্ করে ঘোরাতে লাগল। হাণ্টারগঞ্জের রাস্তাটাই বেশি ঘোরালো না ষ্টিয়ারিংটাই বেশী ঘুরলো বুঝতে পারলাম না।

রাত প্রায় দুটো। হাণ্টারগঞ্জ থেকে জঙ্গলের ভিতরে চলেছি

এমন সময় একটি খাড়া চড়াই-এর মুখে জীপটা বাঘের গন্ধ পাওয়া কাঁড়ার মতো থরথরিয়ে থেমে গেল।

সবাই উৎসুক হয়ে শুধোল। কি ব্যাপার? ব্যাপার সাংঘাতিক। সামনে কুড়ি মাইল, পিছনে কুড়ি মাইল, জীপে এক ফোঁটা তেল নেই। তেল যে কেন নেই এ কথা কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করলাম না—কারণ তাহলে খামোখা বন্ধুবিচ্ছেদ হত।

ওভারকোটের কলার তুলে কিছুক্ষণ জীপে বসে ঘুমোনোর চেষ্টা করা গেল। শেষে 'দুত্তোর' বলে, জীপ থেকে নেমে কাঠ-কুটো সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে গোল হয়ে বসলাম। জুতোসুদ্ধ পা আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম—তাতেও জুতো পোড়া দূরে থাকুক চরণ কমল গরম হতেই পাঁচ-দশ মিনিট লেগে গেল। বাবুল বলল, রাত আর বেশি নেই—গল্পগুজব করে ভোর করে দেওয়া যাক। কিন্তু শিকারের গল্প ছাড়া অন্য গল্প চলবে না। মামুলি গল্প হলেও চলবে না—। আমি শুধোলাম, তবে কিরকম গল্প? বাঘ ঘাড়ে পড়ে তোমাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, তারপর তুমি ভোরে উঠে, দাঁত মুখ ধুয়ে বাঘকে গুলি করে মারলে? বাবুল বলল, সে গল্পও নয়, আরো আন্—কনভেনশনাল গল্প। ঋজুদা ওভারকোটের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে বসেছিলেন। বললেন, শোন্ তাই বলি।

সে আজ অনেকদিনের কথা। তখন জওয়ানী ছিল। তোদের মত বয়স—চলতাম ফিরতাম একদম মস্ত। লোকে বলত বাঙালীর বাচ্চা না বাঘের বাচ্চা ঠাহর করা যায় না। তোরা ত জানিসই কাজের মধ্যে ছিল খাওয়া আর শিকার।

আলমোড়া থেকে পান্নুয়ালা যে রাস্তা চলে গেছে, বড়েছিনা হয়ে, সেই রাস্তার পাশে একটা পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে ক্যাম্প করে আছি। আহা! কী সুন্দর জায়গা। সারাদিন চির আর পাইনেরা হাওয়ার কাকই দিয়ে তাদের বাদামী চুলের গোছ আঁচড়াচ্ছে। কুলকুল করে বয়ে চলেছে পাথরে পাথরে বারিবিন্দু

ছিটিয়ে পাহাড়ী নদী। কূমায়নী ছেলে ভেড়ার পাল চরাতে এসে বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে হাওয়াটাকে সুরেলা করে তুলেছে। কিন্তু তবু আমার মন ভালো না! কারণ দুদিন থেকে আমার খাস বাবুর্চি রহমত নেই—'তার' পেয়ে দেশ গেছে।

সেদিন ভোরবেলায় কোথা থেকে জানিনা খবর পেয়ে এক বাবুর্চি এসে তাঁবুর ঝালর ঠেলে সেলাম করে দাঁড়াল। আমি বললাম, যে সে বাবুর্চিতে ত আমার চলবে না ভাই, আমার বাবুর্চি হতে হলে হিম্মত চাই। রান্নার হিম্মত ও বাঘকে না ডরানোর হিম্মত। ও বলল, হুজুর মেহেরবাণী করকে মেরা হিম্মতদারী জেরা দেখিয়ে। বললাম, অলরাইট,—রেঁধে খাওয়াও দেখি—কিন্তু স্রিফ একটি পদ। মাসকলাই ডাল ছাড়া যা খুশি তাই রাঁধতে পার, কারণ মাসকলাই ডালের গন্ধ অবধি আমি সইতে পারি না।

সন্ধ্যাবেলায়, ডিনারের সময় একটি স্যুপ দিল সে। বড় উপাদেয় —এক কথায় উম্‌দা। অ্যাসপারাগাসের স্যুপ ছাড়া কোন স্যুপ আমার ভাল লাগে না—কিন্তু সে স্যুপ বার বার করে চেয়ে খেলাম। একবার মনে হল, কোনো মাছের স্যুপ, আর একবার মনে হল মাছ আর আপেল মিশিয়ে করেছে। কিন্তু ধরতে পাঁরলাম না। খাওয়ার পর তাকে যখন শুধোলাম যে, তুমি যে একটিই পদ রেঁধে খাওয়ালে তাতে আমি পরম তৃপ্ত হয়েছি—কিন্তু স্যুপটা কিসের? জবাবে মস্ত বড় কুর্নিশ করে বান্দা বলল,—"হুজৌর কা একবাল্‌সে ইসে মাসকা-ডাল হ্যায়—জিসসে হুজৌরকা নফরৎ হ্যায়।" অর্থাৎ, হুজুরের কৃপায় এ মাসকলাইর ডাল—যা হুজুর মোটে দেখতে পরেন না।

আমরা বললাম, চমৎকার। কিন্তু বাবুল বলল, এটা কি শিকারের গল্প হল? স্যাটাদা ধমক দিয়ে বললেন, হবে—শিকারের গল্পই হবে—এটা শিকারের পটভূমি। আমরা আগুনে হাত সেঁকতে সেঁকতে সমস্বরে বললাম, বলুন।

স্যাটাদা আবার আরম্ভ করলেন।

সেদিন সারাদিন গোটা চারেক ঘুরাল মেরেছি। আমার তাঁবুর ছেলেগুলো খুব খুশি। একটা ত ট্রফি হিসাবে খুবই ভাল। তবে তোমরা ত জান, হরিণ কি পাহাড়ী ছাগল, মাংস আমার কোনটারই ভাল লাগে না। তাই তাঁবুর বাইরে আগুনের পাশে, ক্যাম্প চেয়ারে বসে বই পড়ছি। সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ! আমার পাশে একটা কাঠের তেপায়াতে প্রেশার-কুকারে একটি কালীজ ফেজেন্ট সেদ্ধ চড়িয়েছি। বিকালে মেরেছি ওটাকে। আমার রাতের খাদ্য। কুকুরটার দিকে মাঝে মাঝে নজর দিচ্ছি, কার এর সেফ্‌টি ভাল্‌ভটা খারাপ হয়ে গেছে। আকাশ ভরা তারা—বেশ ঠাণ্ডা বাইরে, নীচে থেকে ঝর্ণার কুলকুলানি ভেসে আসছে—ভারী ভাল লাগছে। এমন সময় প্রায় আমার পিঠের কাছে একটা বাঘের গর্জন শুনলাম। এত কাছে যে, মনে হল আমার ড্রেসিং গাউনে তার থুথু ছিটলো। আমি শুনেছিলাম যে, এ অঞ্চলে একটি মানুষখেকো বাঘ ঘোরাফেরা করছে। বুঝলাম যে, মাই সুইট বেব্ হ্যাজ কাম। কেন জানি, হঠাৎ আমার মনে হল—এ বাঘ আমি রাইফেল দিয়ে মারব না। যেই মনে হওয়া অমনি কাজ। আমি পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছিলাম যে, বাঘ বাবাজী আস্তে আস্তে আমার দিকে এগোচ্ছে। আমি যেন কেয়ারই করছিনে, এমন ভাব করে বই পড়তে লাগলাম। এদিকে শোঁ শোঁ করে প্রেসার কুকারে আমার কালীজ ফুটছে। যখন বুঝলাম যে, কুকারের যাচটা এবং বাঘের লাফানো দুয়েরই সময় হয়েছে, আমি অমনি এক লাফে তাঁবুর মধ্যে—তার পরই একটা মেদিনী কাপানো আওয়াজ। এবং সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় বেয়ে একটা ভারী জিনিস গড়ানোর শব্দ। বাইরে বেরিয়ে দেখি—বাঘ নেই—কুকারটা ফেটে চৌচির—তাঁবুর চারদিকে আধসেদ্ধ পাখিটার ঠ্যাং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

না হয় খাওয়া নাই হল—আমি যে বর্ণ এক্সপেরিমেণ্টর—আমার পরীক্ষা আজ সফল হল। মনের আনন্দে ঘুমুতে গেলাম।

ভোর হতে না হতে আমার খাস বেয়ারা আমায় ঘুম থেকে তুলে বলল, একজন সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বিরক্ত হয়ে কাঁচা ঘুম ভেঙে বাইরে এসে দেখি একটা মাঝ বয়েসী বোকা বোকা ইংরেজ, মাথায় একটা শোলার টুপি, হাতে রাইফেল। আমায় সুপ্রভাত জানিয়ে শুধোলো সে, নীচে যে, বাঘটা মরে পড়ে আছে সেটাই সেই কুখ্যাত মানুষ খেকো বাঘ। আমি মরলাম, অথচ গায়ে গুলীর দাগ নেই—এ কেমন করে সম্ভব হল? আমি বললাম, "ইয়ংম্যান শীতের সকালে এসেছ, বসো, কফি খাও।" এই বলে মাটি থেকে কাল রাত্রের বিক্ষিপ্ত এক টুকরো কালীজের ঠ্যাং তুলে তার নাকের সামনে ধরে বললাম,—এই হল "দি সোবার ওয়ে অফ কিলিং ম্যান ইটারস।" সাহেব ত শুনে অজ্ঞান হবার জোগাড়।

কফি টফি খেয়ে যাবার সময় সাহেব অনেক হ্যাণ্ডশেক করে বলল যে, বাঘটাকে মারবার জন্যে সেও অনেক চেষ্টা করেছিল—তা যাই হোক—সেত মারলে রাইফেল দিয়েই মারত—তার বেশি কি আর হত। সাহেব চলে গেল। যাবার সময় বলল, তার শিকারের নাকি খুব শখ। আমার শিক্ষানবিশ হতে চাইল। আমি বললাম, "সময় কোথা, সময় নষ্ট করবার?"

বাবলু বলল, "সাহেবের নাম মনে আছে নাকি স্যাটাদা?"

স্যাটাদা নড়ে চড়ে বসে বললেন, "আছে বইকি তার নাম জিম করবেট।"

আমারা সমস্বরে বললাম, "জয় স্যাটাদার জয়।"

এমন সময় আগুনের মধ্যে ফটাং করে একটা কাঠ ফাটার শব্দ হল। স্যাটাদা চমকে উঠে বললেন, কী ও? বাবুল বলল, কিছু না প্রেশার কুকার।"

———

এগার অরণ্যের দেবতা

অরুণ বাগচী

সাবরু নদীর ধার পর্যন্ত এসে গোটা দলটা থমকে দাঁড়াল। একটু আগে সূর্য অস্ত গেছে। গাছগাছালির আড়ালে পশ্চিম আকাশের লালিমা একটু একটু দেখা যাচ্ছে। কলকল বয়ে যাওয়া নদীর মৃদু রক্তাভা।

জঙ্গল এখানে একটু পাতলা। ঝোপঝাড়ের আড়ালে থেমে হাতিগুলো দেখল দলের সর্দার শুঁড় তুলে হাওয়া শুঁকছে, কাছেপিঠে শত্রু আছে কিনা খোঁজ নিচ্ছে। শত্রু আর কে হবে? বনজঙ্গলে কে আছে যে বুনো হাতির সঙ্গে খামাখা টক্কর দিতে আসবে। কার অত সাহস? বাঘ পর্যন্ত মানে মানে দূরে থাকে। এক বুনোমোষ হচ্ছে জাতপাগল। এমনিতে শান্ত শিষ্ট। কিন্তু হঠাৎ যে কেন কখন রাগী হয়ে যাবে কেউ বোঝে না। তখন হাতিটাতিতেও পরোয়া থাকেনা তার।

শত্রু হচ্ছে মানুষ। ওই দুপেয়ে জন্তু, যাকে দেখতে এইটুকুন, যার গায়ে জোর নেই, দাঁত নেই নখ নেই, না পারে দৌড়তে না কিছু। কিন্তু শরীর ভরা দুষ্টুমি। চটপট গাছে উঠে যায় বানরদের মতো। জলে সাঁতার কাটে মাছেদের মতো। হাতিরা এ দুটো পারে না। জলে গা ভাসাতে অবশ্য পারে। আর গাছে ওঠার দরকারটাই বা কী? শুঁড় দিয়ে উঁচু উঁচু গাছের কচি ডালপালা পেড়ে আনা খুব সহজ কাজ। সে কিছু না। তবে ওই যে মানুষগুলোর হাতে লম্বা লাঠি থাকে সেগুলো ভয়ানক কামড়ায়। আর একটা ছোট লাঠি থাকে যার ধমকে জঙ্গল কাঁপে। ওই ধমক আর আগুন সব জীবজন্তু ভয় পায়। ভয়ে মরেই যায় হরিণ শুয়োর মুর্গী। দলের যে এক নম্বর হাতি, গোটা দল যার কথায় চলে ফেরে, সেই

দলপতিও জানে ওই আগুনলাঠির দাপট কত। নিজে দুবার কামড় খেয়েছে। একবার তো মরেই যাচ্ছিল। অন্তত চারটে হাতিকে মরতে দেখেছে। মানুষরা শত্রু না তো কী?

ঘাসজমি পেরিয়ে নদীর জলে সামনের দুপা সাবধানে রেখে শুঁড় ডুবিয়ে জল ছেটালে দলপতি। ফুর্‌র্‌র্‌র্। সঙ্গে সঙ্গে দলের আর সবাই ঝোপ মশমশিয়ে এগিয়ে যেতনা। বাচ্চা হাতি দলে চারটে। তাদের আগ্‌লে আগ্‌লে মা হাতিরা জলে নামল। শীত এখনও জাঁকিয়ে আসেনি। তবে গরমও নেই। ঠাণ্ডা জল গায়ে লাগতে বাচ্চাগুলো গলায় খুনখুন আওয়াজ তুলল। মজা পেয়ে তাদের দাদাগোছের হাতিরা আরও জল ছিটিয়ে দিলে গায়ে। দলের বড়মা-হাতি চোখ পাকিয়ে এগিয়ে গেল বটে। কিন্তু সবাই বুঝল সেটা ও মজা করে। আসলে মোটেই রাগ করেনি বড়মা কারো ওপর।

সেই সদিয়া রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে এতদূরে চলে এসেছে আসাটা সুখের হয়নি। প্রতি বর্ষার হাতির দল উঠে যায় মিশ্‌মি পাহাড়ের দিকে। ঢেলে বর্ষা নামে আসামের এই বনজঙ্গলের মুলুকে। আকাশ আর নদীর রঙ এক হয়ে যায়। আর কী জল। নদী খাল বিল সব যেন সমুদ্দুর। মাছেদের ফুর্তি। কিন্তু জীবজন্তুর, জগতে সামাল সামাল রব।

হাতিদের মুশকিল সব চাইতে বেশী। অত বড় শরীর। খাবার চাই প্রচুর। লুকোবার জায়গা চাই প্রচুর। আর দল বেঁধে বাস করা ওদের স্বভাব। একলা বা দুটি প্রাণীর যা সমস্যা ওদের তার চেয়ে অনেক বেশী। তাই বাদলা নামতে না নামতে ওরা চলে যায় পাহাড়ে। শরতের নীল আকাশ আবার ওদের ডেকে নিয়ে আসে সমতলে।

এই দলটা প্রতি শীত কাটায় রঙমালার জঙ্গলে। ভারী সুন্দর ছড়ানো জঙ্গল। জীবজগতে বন্ধুবান্ধবও বিস্তর। খাবারের অনটন নেই। আগুন-লাঠি হাতে শিকারী জঙ্গলে অবশ্য ঢোকে। তবে তাদের লক্ষ্য পাখি মুর্গী বা হরিণ। হাতিদের বড় একটা জ্বালাতন হতে হয় না। দুপেয়েগুলোপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এদিকে ওদিকে। যার যার নিজেদের ব্যস্ততা নিয়ে।

তারাজ্বলা অন্ধকারে সাবরু নদী পেরোতে পেরোতে দলপতি ভাবছিল আজ রাতটা মিরিহারামের জঙ্গলেই কাটাবে। ওখান থেকে রঙমালার বন মোটেই দূর নয়। কিন্তু তবু রাতটা মিরিহারামেই কাটানো ভালো।

আসলে ভিতরে ভিতরে একটু কাবু হয়ে পড়েছে দলপতি। বয়স হচ্ছে সেতো বটেই। সারা জীবনের যত বিপদ ঝঞ্ঝাট ঝগড়া—শরীরের নানা জায়গায় নানান ক্ষত—সব এখন যেন থেকে থেকেই টনটনিয়ে ওঠে। বাঁ পা টানতে কষ্ট হয় মাঝে মাঝে। এখন যদি তার পুরানো শত্রু সেই লেজছাঁটা বাঘটা বা ডান শিং একটু ভাঙা সেই মোষটা লড়াই করতে আসে তবু দলপতিকে জব্দ করতে পারবে না। ও তাদের মহড়া নিতে পারবে অক্লেশে। যদি দলের উঠতি জোয়ান মদ্দা হাতিগুটোর একটাও তেরিয়া ভাব দেখায়, ও গ্রাহ্যও করবেনা একফোঁটা দলপতির ভয় অন্যত্র।

সে বেশ বুঝতে পারছে ওই দুপেয়েগুলোর সঙ্গে লড়াই করে সবাই হেরে যাচ্ছে। হাতিরা হারছে, বাঘ মোষ গণ্ডার শুয়োর সাপ সবাই হারছে। এমনকি এই যে বিরাট ভয়াল অরণ্য, এই উঁচু উঁচু আকাশ ছোঁয়া আলো-আড়াল করা প্রাচীন বনস্পতি—এগুলোও হেরে যাচ্ছে। খুব বাচ্চা বয়সে একবার পিঁপড়েদের ওপর খুব রেগে গিয়েছিল সে। বুনোজামের কচিপাতা আরাম করে খাচ্ছে, খেয়ালই নেই যে একটা মস্ত পিঁপড়ের বাসা ওই ডালে রয়েছে। বিষপিঁপড়ে-গুলো ভয়ে হোক রাগে হোক তিড়বিড় করে বেড়াচ্ছিল। তাঁর ছোট্ট শুঁড়ে নাকে মুখে চোখের কোলে এমন ডজনে ডজনে কামড়ে দিয়েছিল যে বেচারা ছটফট করে মরে। তারপর পিঁপড়ে দেখলেই ও ক্ষেপে যেত। লড়াই করতে যেত তাদের সঙ্গে।

দলের সবচেয়ে বুড়ো হাতি জগদ্দলকে গোটা দলটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। করত না শুধু দলপতি, এই এখনকার দলপতি, দলপতির বাপ। বাচ্চাটাকে খুব ভালোবাসত জগদ্দল। ওর ওই পিঁপড়ের সঙ্গে যুদ্ধ দেখে একদিন চুপচুপ করে বলেছিল, হাতি হয়ে হাতির মর্যাদা ভুলে গেলি? ওইটুন পিঁপড়ে, ওদের কী ক্ষতি তুই করবি? আর তাছাড়া শোন্, এই জঙ্গলে কটা হাতি বলতো? পিঁপড়ে ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক সবদিক। কটাকে তুই মারবি? শিক্ষা দিবি? ছাড় ওসব পাগলামি।

ওটা ভাবলে হাসি পায় এখন দলপতির। কিন্তু মানুষ তাকে ভাবায়। খুব ভাবায়। ওই পিঁপড়েদের মতোই যেন অসংখ্য হয়ে পড়ছে দুপেয়েগুলো। যেদিকে যাও সেদিকেই ওরা। এই এবার মিশ্‌মি পাহাড় থেকে সমতলে আসতে গিয়েও বারবার হোঁচট খেয়েছে

দলটা। চেনা জঙ্গল সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সেই জায়গায় গজিয়ে উঠছে গ্রাম আর গ্রাম। কিলবিল করছে মানুষ আর মানুষ।

মানুষ মানে শুধুই ঝামেলা তাও অবশ্য নয়। গ্রাম মানে খেত খামার। পাকা ধান, মকাই, আঁখ। একটা মাঠে আধরাত কাটালে পেটপুরে খাওয়া হয়ে যায়। শরীরের মজাটাই তখন অন্যরকম। সারাদিনটা জঙ্গলে ছায়ায় ছায়ায় কী আলস্যে স্ফূর্তিতে কেটে যায়। কিন্তু ওই জঙ্গলটাই যে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

সনিয়ার রিজার্ভ ফরেস্ট কী ঘন সুন্দর গাছে ভরে থাকত দুপেয়েরা এসে গাছ কাটত। কিন্তু সেতো বুড়ো বুড়ো গাছ। বন তাতে আরও সবুজ, আরও প্রাণবন্ত হয়ে থাকত। এখন যেন বাছ-বিছার নেই। মানুষ আসছে আর ধমাধম গাছপালা কেটে সাফ করে দিচ্ছে। দেখবার শোনবার থামাবার কেউ নেই!

গোটা দলটা এসে মিরিহারামের মাটিতে পা রাখলে। দলপতি গলায় শব্দ তুলে বললে: সাবধান। কেউ এগিও না। আগে আমি দেখে আসি চারদিক।

॥ ২ ॥

ঝলমল করছিল দিনটা। বন্দুকের নলে চোখ রেখে দেখছিল নন্দেশ্বর ময়লা টয়লা আছে না কি। নেই একরত্তি, তবু আবার পশমী ন্যাকড়াটা ঢুকিয়ে দিলে নলের মধ্যে। বন্দূক সাফ রাখা তার অভ্যাস ছিল, এখন ব্যারাম হায় দাঁড়িয়েছে।

"এস ডিও সাহেব মুক্তারামবাবু এতক্ষণ ভ্যাজর ভ্যাজর করে গেছেন এমন যে বন্দূক সাফ না করে তোর কান সাফ করাই উচিত ছিল"—বললে, "সে তুই কর। আমার এ কান দিয়ে কথা ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।"

ইরসাদ একটু গম্ভীর হয়ে বললে, "নন্দেশ্বর, তুই অত বেপরোয়া হোস না রে। এস ডিও সাহেব লোক ভালো না। তোকে মুশকিলে ফেলে দেবে।"

নন্দেশ্বর বললে, "যা যা। সেদিনের ছোকরা হয়ে আমাকে জঙ্গল চেনাতে আসে। আমি বলছি হাতিটা মোটেই পাগলা না। ওকে গুলি মারা উচিত না। তা কথা কানেই নেবে না সাহেবটা? তুই বল, জঙ্গল ও বেশী জানে, না তুই আমি?"

ইরসাদ বললে, "সে কথা হচ্ছে না। রঙমালার দক্ষিণ জঙ্গলটা

সাফ করে বস্তি বসাতে চায়। তাই ওই হাতির দলটাকে তাড়াবে। যতবারই আমিনরা যায় জমি মাপতে, কাঠুরিয়ারা যায় জঙ্গল কাটতে, হাতি দেখে পালিয়ে আসে। বনোয়ারা কাঁচা বুদ্ধি দিয়েছে, দলের বড় হাতিটাকে মেরে ফেলুন সাহেব, দলটাই ভেগে যাবে। তাই না মুক্তারামবাবু উঠে পড়ে লেগেছেন হাতিটাকে মারতে! তুই কেন বাধা দিবি?"

নন্দেশ্বর অনেকক্ষণ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, ইরসাদ, তুইও একথা বলছিস? এই জঙ্গল আমার মা, তুই জানিস না? সারা জীবন শিকার করেছি এই রঙমালার বনে। অনেক প্রাণী মেরেছি। ঠিক কথা। কিন্তু তুই বল, এমনি এমনি কখনও মেরেছি? যেটুকু দরকার সেটুকু। এই শের আছে, শুয়োর আছে—কী নেই! দেখেছিস কখনও কেউ কাউকে এমনি এমনি মারছে? মাংসের লোভে আমরা পাখি হরিণ মুর্গী সজারু মেরেছি। প্রাণ বাঁচাতে বাঘও মেরেছি দুদশটা। তা দেখ, বাঘ মারতে গিয়ে কত মারা গেছে। মতিনের কথা মনে আছে? বড়ুয়াবাবুদের আজ এই এস ডিও-টা মাড়োয়ারী টাকা খেয়ে যা করতে বলছে তা করা উচিত? তোর বা আমার?"

ইরসাদ বললে, "মানুষও বাড়ছে কত। নতুন নতুন বস্তি না বসালে লোক থাকবে কোথায়? সেটাও দেখ।"

নন্দেশ্বর বললে, "আমি তোর মতো একটা পরীক্ষাও পাশ করিনি রে ইরসাদ তবু বলতো পৃথিবীটা কি শুধু মানুষদের? পাখি বানর হাতি হরিণ বাঘ—এদেরও না? এমন সুন্দর একটা জঙ্গল। সেটা কেটে ফেলতেই হবে? এই কথাটাই তো বুঝতে পারছিনে। কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিবি? আর ওই যে হাতিটা। তুই জানিস না, গত কুড়ি বছর ধরে আমি ওকে দেখে আসছি। ওর খাওয়া কান নাড়ানো, শুঁড় দোলানো। ওর জলে ফোয়ারা তুলে স্নান। চাঁদের আলোয় স্থির দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত দলকে পাহারা দিচ্ছে, যেন একটা পাহাড়ের টুকরো। জানিস, ওকে আমার জঙ্গলের দেবতা বলে মনে হয়। সাহেব যতই ফন্দী আঁটুক, হাতিটাকে আমি মারতে দেব না।"

॥ ৩ ॥

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে গোটা দলটাকে নিয়ে এগোচ্ছিল দলপতি। দক্ষিণ জঙ্গলের শেষে নেপালীদের গ্রাম। সেখানে আজ

রাত্রে ফসল খেতে যাচ্ছিল হাতিরা। বাচ্চা হাতিদের সামলে একেবারে শেষে আসাছল জগদ্দল।

উঁচু টিলাটার ওপর প্লাসটিকের চাদর পেতে তার ওপর বসেছিলেন মুক্তারাম বাবু। আচমকাই এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। চারদিক ভিজে শপ্ শপ্। হি হি কাঁপুনি উঠে আসছে মাটি থেকে। কয়েকদফা চা খেয়ে ফ্লাস্কটা প্রায় খালি করে এনেছেন এস ডিও সাহেব। পাশে রাইফেল হাতে বসে মনিরাম শিকারী। শিবসাগরে জরুরী তলব পাঠিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এসেছেন মুক্তারামবাবু।

মণিরাম অভয় দিয়ে যাচ্ছিল। "কিচ্ছু চিন্তা নেই স্যর। যত বড় হাতিই হোক, আমি এই রাইফেল দিয়ে তাকে কাৎ করে ফেলব। তবে পরে দেখবেন স্যর। যেন বিপদে না পড়ি। হাতি মেরে শেষে জেল খাটতে না হয়।"

মুক্তারাম বাবু বললেন "আরে দুর! আমি আছি কী করতে? হাতি মারা আইনে বারণ, সে কি জানিনে! তবে হাতি যদি আক্রমণ করে তবে আত্মরক্ষার জন্য তাকে মারা চলে। আর মারা যায় হাতি পাগল হয়ে গেলে। আগে তুমিতো মারো। তারপর যা করার আমি করব। সারটিফিকেট লিখে দেব তোমাকে। কিছু ভেবোনা।"

মণিরাম বললে, "আজ পরিবেশটা ভালো। হাওয়াটা উলটো দিক থেকে বইছে। অনেকদূর থেকে আমরা হাতির গন্ধ পাব। ওরা একেবারে কাছে এসে না গেলে পাবে না।"

চলতে চলতে দলপতি থমকে দাঁড়াল। জঙ্গলের শুঁড়ি পথে ওটা কী সামনে রাস্তা বন্ধ করে? এদিকটায় বন পাতলা হয়ে এসেছে। অদূরেই খেত, গন্ধ ভেসে আসছে ধানের। দেখাও যাচ্ছে। এই সময় ওটা হঠাৎ কোথা থেকে এলো?

দলপতিকে দাঁড়াতে দেখে গোটা দলটাই স্থির হয়ে গিয়েছিল। একটা দুরন্ত বাচ্চা কেবত কৌতূহল চাপতে না পেরে এগিয়ে যাচ্ছিল সামনে। শুঁড়ের ঝটকায় মাটা তাকে শাসন করে দিলে।

সামনেই ডুমুর গাছের ডালে বন্দুক হাতে বসে ইরসাদও চিনতে পারছিল না শিকারী নন্দেশ্বরকে। খালি গা, পরণে শুধু-ময়লা একটা ল্যাঙ্গট। মাথায় মিশমি টুপির ওপর গাছের কটা তিরতির ডাল বেঁধেছে। কোমর থেকে ঝুলছে আরওকিছু ডালপালা। হাতির দলটাকে দাঁড়াতে দেখে নন্দেশ্বর আস্তে আস্তে শরীর দুলিয়ে নাচ জুড়ে দিল।

"যা যা গণেশ বাবা ফিরে যা
সামনে দুশমন সামনে মৃত্যু আসিস না
জঙ্গলে যা পালিয়ে জঙ্গলের ছা!"

মিরি ভাষায় এই ছড়া সেই ছেলেবেলায় গাইতে শুনেছে মাকে এই অসময়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল নন্দেশ্বরের।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুঁড় নাড়ছিল দলপতি। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছিল। দুপেয়েটা চায় কী? হাতে তার খোঁচা দেবার লাঠি নেই, নেই আগুন ঝরানো মরণ-লাঠি। ওকে তো এখুনি পিষে মেরে ফেলা যায়। কন্তু দুপেয়ে বোকাটা চায় কী?

বন্দুকের ঘোঁড়া তুলে স্থির বসেছিল ইরসাদ। নন্দেশ্বর জানেই না সে পিছু পিছু লুকিয়ে এসেছে বন্ধুকে পাহারা দিতে। হাতিটা আক্রমণ করতে চাইলে সে ঠিক গুলি ছুঁড়বে। নইলে নয়। অবশ্য নন্দেশ্বরকে বাঁচানোর কোনো মানে হয়না। ওটার মাথা যে খারাপ হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। তা হোক, সেই ছোটবেলা থেকে দোস্তি। সেটা কি ভোলা যায়?

গলায় শব্দ তুলে দলপতি খানিকটে পিছু হটে আবার দল নিয়ে ফিরে চলল। আজ আর ধান খাওয়া হলনা। কী করা! যাক, জঙ্গলে খাবারের অভাব নেই। দলের সবাই কি ভাবল, একটা মাত্র খালি হাত পা দুপেয়েকে দেখে সর্দার ভয় পেয়ে গেছে? তা ভাবুক। ভয় সে খায়নি। সে এমন একটা কাণ্ড দেখেছে যার কোনও মানে হয় না। তার জঙ্গলে বুদ্ধিতে কিছুই বোঝা গেলনা। তাই সে দলের কথা ভেবেই ফিরে যাচ্ছে। দল আগে তার নিজের সম্মান অসম্মান পরে।

ইরসাদ নেমে এলো গাছ থেকে। "আজ, তুই ওকে বাঁচালি কাল কী করবি?"

নন্দেশ্বর তার সব দাঁত বের করে হাসল। "সে কাল দেখা যাবে। দেখলি হাতিটাকে? ঠিক জঙ্গলের দেবতার মতো দেখতে নয়?"

দুই বন্ধু গলা জড়াছড়ি করে করে ফিরে চলল। গাছের ওপর থেকে একপাল রূপী বানর তাদের উঁকি মেরে দেখতে লাগল।

টিলার ওপর মশা তাড়াতে মনিরাম শিকারী বললে, "কী ব্যাপার, বলুন তো স্যর! হাতির গন্ধ স্পষ্ট পেলাম। অথচ হাতি খেতে নামলোই না। জন্মে এমন ব্যাপার দেখিনি।"

বিরক্ত মুক্তারামবাবু বললেন, "চোপরও। ফের কথা বললে ঠেলে নীচে ফেলে দেব!"



ংকলক ঃ অশোক মুখোপাধ্যায়

পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে নানান্ পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। াদের মধ্যে 'গল্পভারতী' ও 'যুগান্তর সাময়িকী'র কয়েকটি গল্প রসিক পাঠক-াঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'কাছের মানুষ' —একটি উপন্যাস। পরে এর আরও একটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। ীবিকাসূত্রে সাংবাদিকতার জন্যে এঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্য সাধনা কিছু পরিমাণে াধাপ্রাপ্ত হয়। মাঝে 'মধ্যে ইনি একটি ছদ্মনামে (চণ্ডাশোক ভরদ্বাজ ছড়াও লিখে থাকেন। কয়েক বছর হল ছোটদের জন্যেও কলম ধরেছেন, অনুবাদেও ঁর অবদান আছে। 'নাবিক সিন্দবাদ' (১৯৫৭ পূজা) ও সম্প্রতি প্রকাশিক অমর কাহিনী আরব্য রজনী', বই দুটিই এর প্রমাণ।

* * *

শিল্পী ঃ

মুর্শিদাবাদের ছেলে, তরুন উদীয়মান শিল্পী পার্থ প্রতিম বিশ্বাস। শিল্পীর থায় কলকাতায় আসার একমাত্র কারণ আঁকার লাইনে সুযোগ করে নেওয়া। ষ্টার ত্রুটি না থাকলে আর প্রতিভা থাকলে জায়গা আ াদের ছেড়ে দিতেই ব।" আর্ট কলেজে না পড়েও কাজের পারফেকশানে আসা যায় তার প্রমাণ ই শিল্পীর নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা।

গুনীজনের সপ্রশংসা অনুপ্রেরনা সযত্নে ঝুলিতে ভরে শিল্পী পার্থ প্রতিম শ্বাসের একমাত্র চিন্তা তাঁর তৈরি এই প্রচ্ছদ ও অন্যান্য শিল্প কর্মের আরো ভিনবত্ব কি ভাবে আনা যায়। প্রচ্ছদ পটে বিপ্লব আনাই ওর একমাত্র স্বপ্ন।